MA-01-BENG-02

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম (০৯)
M. A. in Bengali (09)

প্রথম ষাণ্মাসিক

দ্বিতীয় পত্র (Paper : 2)
আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

প্রথম বিভাগ ঃ বাংলা গদ্যের বিকাশ, সাময়িক পত্র এবং প্রবন্ধের ইতিহাস

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ উপন্যাস— রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ও রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় বিভাগ ঃ উপন্যাস— রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-পরবর্তী

চতুর্থ বিভাগ ঃ বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত

Contributor :

Sri Ratnadip Purkayastha	Department of Bengali Digboi Mahila Mahavidyalaya

Course Co-ordination :

Prof. Pranab Jyoti Das	Director i/c, GUIDOL
Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Dipankar Saikia	Editor, Study Material GUIDOL

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University

Proof Reading & Language Editing :

Sanjay Chandra Das	Research Scholar Dept. of Bengali, Gauhati University

Format Editing :

Dipankar Saikia	Editor, Study Material GUIDOL

Cover Page Design :

Bhaskar Jyoti Goswami	GUIDOL

ISBN No : 978-81-928318-1-7

Reprint : May, 2016

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work be reproduced in any form, by mimeography or any other means, without permission in writing from the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning. Further information about the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning by Prof. Pranab Jyoti Das, Director i/c and printed at Gauhati University Press, Guwahati-14. Copies printed 500

পত্র পরিচিতি

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস শীর্ষক পাঠক্রমে অর্থাৎ দ্বিতীয় পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই।

এই দ্বিতীয় পত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস। সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথাগত আলোচনা শুরু করার আগে পাঠক্রমের তাৎপর্য বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আসুন আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিকে মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি ভূমিষ্ঠ হল। বাংলা ভাষা এই নতুন সৃষ্ট ভাষাগুলির অন্যতম। চর্যাগানগুলির মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলাভাষার পদচারণার প্রথম সূত্রপাত। হাজার বছর আগে এক বিশিষ্ট ধর্মসাধনার ইঙ্গিত-প্রকরণ ও সাধনা পদ্ধতি ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে তা সাহিত্যক্ষেত্রে বিচিত্র ফসল ফলিয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম ভাবনাশ্রিত জীবনবৃত্তকে ত্যাগ করার ফলে আধুনিক যুগে এসে বাংলা সাহিত্য বিষয়গৌরবে ধনী হয়ে উঠল। শুধু বিষয়বস্তু নয়, পরিবর্তন সাধিত হল আঙ্গিক এবং রূপ-রীতিতেও; ছন্দ নির্ভরতার পরিবর্তে বাংলা সাহিত্য আশ্রয় গ্রহণ করল গদ্যের সাবলীলতায়। নব নব ভাব-কল্পনার প্রকাশে, নতুন নতুন প্রতিভার স্পর্শে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যের শিরোপা অর্জন করল। কিন্তু সাহিত্য সময় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একক বা স্বয়ম্ভু কিছু নয়। তাই বাংলা সাহিত্যের এই বিশ্ববীক্ষা ও হাজার বছরের এই পরিক্রমায় হাজার বছরের বাঙালি জীবন ছায়াপাত করেছে, বাঙালির দেশ-কাল, সময়-সমাজ, প্রতিবেশ-পরিসর, সংঘাত-সংশ্লেষের ছাপটি মুদ্রিত হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কালপর্বের বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতিগুলির অন্তরঙ্গে ধরা পড়েছে বৃহত্তর বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, তার পালাবদলের ইতিহাস।

বস্তুত আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যের যে প্রচার প্রসার ও সমৃদ্ধি তার উৎসটি নিহিত রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যাপদের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চর্যাপদের যুগ থেকেই ধর্মের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল মূলত একই ধরনের। মাঝেমাঝে রাজনৈতিক অবস্থা সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হলেও বাঙালির জীবনযাত্রা-প্রণালিতে কোনো বৃহত্তর পরিবর্তন আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। যে যুগে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। খণ্ডিত জীবনবোধ, সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামক্ষত মানুষের উচ্চকণ্ঠ বেদনা তৎকালীন সাহিত্যে ধরা পড়েছে।

তবু, ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের দিনগুলিতেও তৎকালীন সাহিত্যে মানবতা ও জীবনমুখিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ নাথ সাহিত্য, মৈমনসিংহ

গীতিকা এবং রোসাঙ রাজদরবার কেন্দ্রিক সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া অব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নানা শাখার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন মানবতারই নবায়ন ঘটেছিল। বস্তুত আদি যুগ-মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সাহিত্য একই মৃত্তিকাসম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে বাঙালির ধ্যান ও সাধনা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির সমগ্র চেতনা-প্রবাহ ধরা পড়েছে। বাঙালি জাতি বা বাংলা সাহিত্য নিরালম্ব বা স্বয়ম্ভু নয়। আধুনিক বাঙালি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার হাজার বছরের উত্তরাধিকার প্রবহমান। অতএব, আমাদের আত্মপরিচয় উদঘাটনের জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন। আর এই আত্মানুসন্ধানের মানদণ্ডেই আমাদের আলোচ্য পাঠক্রমের উপযোগিতা।

উনিশ শতক এবং তৎপরবর্তীকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত। উনিশ শতক থেকেই আধুনিক যুগের আরম্ভ। মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনাশ্রিত ছন্দনির্ভর বাংলা সাহিত্যধারায় এই শতকেই অযুত সম্ভাবনা রূপলাভ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নবজাগ্রত বাঙালি-মানস তার আত্মপ্রকাশের জন্য বিবিধ নতুন নতুন পথের অনুসন্ধান করেছিল। এই বিভাগের লক্ষ্য হল উনিশ শতকের নবজাগরণ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের যে বহু-বিচিত্র উৎসার, বিকাশ ও পরিণতি— সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করা। এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের ধারাটিকে অনুসরণ করব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা কেন্দ্রিক সামগ্রিকতার ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালক্রমকে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। আসুন, আমাদের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক—

অধ্যায়-১ ঃ বাংলা গদ্যের বিকাশ, সাময়িক পত্র এবং প্রবন্ধের ইতিহাস

অধ্যায়-২ ঃ উপন্যাস— রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ও রবীন্দ্রনাথ

অধ্যায়-৩ ঃ উপন্যাস— রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-পরবর্তী

অধ্যায়-৪ ঃ বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত

বাংলা সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত সমালোচক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। আমাদের আলোচনার শেষে সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলির তালিকা সংযোজিত হয়েছে। যেহেতু সমস্ত পাঠ্যগ্রন্থ আমরা সরবরাহ করতে পারছিনা, তাই আশা করব এগুলি আপনারা নিজে সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন। বক্ষ্যমাণ পত্রে আলোচনা সংক্ষিপ্তির অনুরোধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা বা বিষয়ের উল্লেখযোগ্য রচনাকার এবং তাঁদের সাহিত্যকৃতিই শুধু আলোচিত হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পঠন বিভাগের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর (Home Assignment) বাড়ি থেকে তৈরি করে পাঠাতে হবে। আপনাদের সুবিধার্থে প্রত্যেক উপবিভাগেই প্রশ্নের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে তবু এই উপকরণের অতিরিক্ত পাঠ, আপনাদের নিজস্ব সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আশা করি এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রথম বিভাগ
বাংলা গদ্যের বিকাশ, সাময়িক পত্র এবং প্রবন্ধের ইতিহাস

বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)
১.১ উদ্দেশ্য (Objective)
১.২ উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাংলা সাহিত্য
১.৩ বাংলা গদ্য-সাহিত্য
  ১.৩.১ শ্রীরামপুর মিশন
  ১.৩.২ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
  ১.৩.৩ রামমোহন রায়
১.৪ প্রথম পর্বের বাংলা সাময়িক পত্র
১.৫ বাংলা গদ্য ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-প্রবন্ধ
১.৭ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা গদ্য সাহিত্য
  ১.৭.১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  ১.৭.২ অন্নদাশঙ্কর রায়
  ১.৭.৩ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১.৮ সংক্ষিপ্ত টীকা (Summing Up)
১.৯ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
১.১০ প্রাসঙ্গিক টীকা
১.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
১.১২ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করে নিজস্ব সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির সচেতনতা বৃদ্ধি পেল এবং সেই সাহিত্যের অপূর্ণতাও বাঙালির দৃষ্টিগোচর হল। নবজাগ্রত বাঙালির সচেতনতার প্রথম প্রতিফলন ঘটল উনিশ শতকের প্রথম পাদে গদ্য-পাঠ্যপুস্তক রচনার উৎসাহে এবং সাময়িক পত্রিকার প্রচলনে। ইংরেজি শিক্ষালব্ধ নব্য-মূল্যবোধের পাশাপাশি সাহিত্যে আধুনিকতা আত্মপ্রকাশ করল। ইংরেজি সাহিত্য-প্রভাবিত শিক্ষিত বাঙালির চিন্তায় আত্মসম্মানের যে বিস্ফার ও দেশানুরাগের যে উৎকণ্ঠ প্রতিফলিত হয়েছিল, তা-ই বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনোবীজ।

এযুগের সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ— তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা-চিন্তা ও জ্ঞানের নানা নতুন দিগন্ত এযুগের বাঙালির কাছে উন্মোচিত হল— যার ফলে কবিতার ভাষা তার কাছে অপর্যাপ্ত বলে মনে হল, জন্ম হল বাংলা গদ্যের। শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রাথমিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে সাহিত্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টির রাজ্যেও

গদ্যভাষা পদার্পন করল, সাহিত্যিক গদ্যের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য বহুমুখী বিচিত্রতা লাভ করল। উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিচিত্র ধারায় গদ্যসাহিত্য প্রবাহিত হল। অবশ্য বক্ষ্যমাণ আলোচনায় কথাসাহিত্য এবং নাটক— বাংলা গদ্যের এই দুই ধারাকে আমরা বাদ দিয়েছি। কথাসাহিত্য এবং নাট্যসাহিত্যের আলোচনা অন্যান্য অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আসুন, এবারে বাংলার নবজাগরণ, বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১.১ উদ্দেশ্য (Objective)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাত্রারম্ভ উনিশ শতকে। ইংরেজি সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালি সেদিন নতুন করে আত্ম-আবিষ্কার করল, তারই প্রতিফল দেখা গেল বাংলা সাহিত্যেও। এই শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির নিকট-সান্নিধ্য লাভ করলেন। এর ফলে বাঙালির চিন্তায়, কর্মে, সৃষ্টিতে বহুবিধ নবত্ব সূচিত হল। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্য তাকেই নবজাগরণ বা রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলার রেনেসাঁসের কারণসমূহ অনুসন্ধান করব, চিহ্নিত করব সাহিত্যক্ষেত্রে রেনেসাঁসের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। রেনেসাঁসের অভিঘাতেই বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের ছন্দ নির্ভরতা ত্যাগ করে, এবং গদ্যের উদ্ভব হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক স্তরের রূপকারদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব; পরবর্তীকালের শিল্পিত ও সাহিত্যিক গদ্য এবং বাংলা প্রবন্ধের প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। কীভাবে বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য একটা পরিণত আঙ্গিকে সুস্থিত হল— সে বিষয়টি আমরা আলোচনা করব; আস্বাদ গ্রহণ করব বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-প্রবন্ধের। এর পর রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিকেও আমরা আলোকপাত করব। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে যেহেতু বাংলা সাময়িক পত্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে, তাই বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব।

১.২ উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাণধর্ম ছিল দেবচেতনা তথা অধ্যাত্মচেতনা। দেবতার লীলাই ছিল উক্ত যুগের বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র উপাদান। বৌদ্ধ ও হিন্দু পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম সাধনাকে প্রকাশ করার জন্যই নীতি বা পাঁচালির আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। দেব-দেবীর লীলা, শাপভ্রষ্ট দেবকুমার-দেবকুমারীর কাহিনি অথবা অবতারকল্প মহাপুরুষের দিব্য-জীবনকথা এগুলিতে স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইংরেজ শাসনাধীন অবস্থায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় বাঙালির চিন্তা-চেতনার সীমা বর্ধিত হল। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই বাঙালি সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বের-মানবসমাজের জীবনধারণ-প্রণালি, সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতির বিচিত্র পরিচয় লাভ করল, আস্বাদ পেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের। পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনবাদী প্রেরণা এবং বাস্তব চেতনার ফলে বাঙালি সাহিত্যিক দেব-দেবীর লীলাকীর্তন পরিহার করে মানব জীবনের অপার বিস্ময়

উপলব্ধি করলেন। এই মানবধর্ম যা সমাজদর্শনে মানবতাবাদ নামে পরিচিত, ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত উনিশ শতকের বাঙালি সেই আদর্শ মনে-প্রাণে গ্রহণ করল। কাব্য-কবিতা, উপন্যাস ও নাটক— সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুঃখ-দুর্ভর মানব জীবনের অশ্রুবেদনা আবেগানুভূতিপূর্ণ বাস্তব কাহিনি অধিকতর আগ্রহে স্বীকৃত হল। উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যের রচনাগত রূপরীতি ও সামাজিকতার ব্যবধান ঘটল।

উনিশ-শতকের বাংলা সাহিত্যে বিশাল বিশ্ব ছায়াপাত করেছে, বিচিত্র জীবনের কল্লোল ধ্বনিত হয়েছে, জীবনের বিশাল প্রত্যয় বিচিত্র বর্ণসুষমায় ফুটে উঠেছে। আত্মপ্রকাশের বাহন ও বিষয়বস্তুতেও এক বড়ো পরিবর্তন দেখা দিল। পুরাতন বাংলা সাহিত্য আশ্রয় করেছিল ছন্দকে আর আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন গদ্য। গদ্যের প্রয়োগের ফলে আবেগের সাহিত্যে মননপ্রণালির সূক্ষ্ম যুক্তি স্থাপিত হল। বস্তুত বাংলা গদ্যই উনিশ শতকের বাঙালির চিন্তাধারাকে সুতীক্ষ্ণ করেছে, যৌক্তিক পারম্পর্যে বিন্যস্ত করেছে, কথাসাহিত্য ও নাটকের ভাষা জুগিয়েছে। উনিশ শতকে বাংলাদেশে মুদ্রণ শিল্পের ক্রমপ্রসারের ফলে চিন্তাশ্রয়ী মানবজ্ঞান যুগপত গভীর ও ব্যাপকতর মহিমা লাভ করল। সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের গভীরতার সম্পর্ক স্থাপিত হল। সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যাপার সাহিত্যের মাধ্যমে, নানা আলোচনার দ্বারা— বিশেষত সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে বাঙালির জীবনধারাকে উচ্চকিত করে তুলল। ইউরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, রেস্টোরেশন এবং আধুনিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি উনিশ শতকীয় বাঙালির জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে বিকাশ লাভ করতে শুরু করল। বাঙালির এই নতুন জীবন-চেতনা, যা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই নবযুগের সূচনা করেছিল, সামগ্রিকভাবে তাকে উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ রূপে অভিহিত করা হয়।

উনিশ শতকের নবজাগরণের দিনগুলিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশের ব্যাকুল বাসনা প্রকাশিত হল। বাংলা সাহিত্যে অনেক নতুন ধারা সংযোজিত হল। আলোচনার সুবিধার জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই বিশাল সম্ভারকে আমরা কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিভক্ত করে এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারি। এবার আমরা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা এবং বিশিষ্ট সাহিত্যকার সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১.৩ বাংলা গদ্য-সাহিত্য

উনিশ শতকের আগে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র এবং অদ্বিতীয় বাহন ছিল পদ্য। দর্শন, ইতিহাস আর আয়ুর্বেদ গ্রন্থের গম্ভীর বিষয়বস্তু ছন্দের বাঁধন স্বীকার করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যের সংস্কার ছিল পয়ার ও অন্যান্য ছন্দের ব্যবহার। গদ্য সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। তবে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে কিছু বাংলা গদ্য ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজাকে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের লেখা একটি চিঠিই বাংলা গদ্যের প্রাচীন দৃষ্টান্ত। চিঠিটি এরূপ—

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন

তোমার আমার সতেষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতয়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" ....

সতেরো শতকেও বিভিন্ন চিঠিপত্রে ও দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু এই ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অতিরিক্ত ফারসি শব্দের ব্যবহারের ফলে। আঠারো শতকে ছেলের নিকট লেখা মহারাজ নন্দকুমারের একটি পত্রের ভাষা বেশ সুগঠিত— "অত্র চারিরোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য। ...নাসাগ্রে প্রাণ হইল।"

এ থেকে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, উনিশ শতকের আগেই বাংলা গদ্যের একটা কর্মক্ষম চেহারা গড়ে উঠেছিল। তবে সাহিত্যকর্মে এর স্থান ছিল না। আঠারো শতকে পর্তুগিজ মিশনারি গোষ্ঠী এদেশের মানুষের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা গদ্য চর্চা করেন। এঁরা নিজেরা চেষ্টা করে পর্তুগিজ বাংলা ভাষার অভিধান সংকলন করেন, কেউ কেউ হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে খ্রিস্টান ধর্মের মহিমা মণ্ডিত পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেগুলি রোমান অক্ষরে পর্তুগালের লিসবন সহরে ছাপা হয়েছিল। তখনও ছাপার অক্ষরে বাংলা হরফের ব্যবহার শুরু হয়নি। এখানে পর্তুগিজ মিশনারিদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করতে হয়— একজন হলেন মানোএল দা আসসুম্প সাঁও এবং অপরজন হলেন দোম আন্তোনিও দো রোজারিও। মানোএল ছিলেন খাঁটি পর্তুগিজ পাদ্রি, তাঁর ভাষায় বিদেশি সুলভ অনেক জড়তা আছে; যদিও তিনি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণগত নিয়মাবলি সংকলন এবং বাংলা ও পর্তুগিজ অভিধান সংগ্রহ করেন। এটির নাম Vocabulario Em Indioma Bengalla, E Portuguez, Dividido em duas Partes (1734). এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি রোমান হরফে লিসবন থেকে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এটি একটি রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টতত্ত্ববিষয়ক পুস্তিকা। মানোএল বাংলা সাধুভাষার ঢঙটি আয়ত্ত করতে একেবারে ব্যর্থ হননি। দোম আন্তোনিও ভূষণার জনৈক বাঙালি জমিদারপুত্র, অল্পবয়সে দস্যু কর্তৃক অপহৃত হন এবং খ্রিস্টান পাদ্রিদের দ্বারা মুক্ত হয়ে তাঁদের আবাসে নীত হন। বয়ঃকালে ইনি একজন পাদ্রি হয়ে উঠেন। তাঁর নামে একটি গদ্যগ্রন্থ পাওয়া যায়, সেখানে হিন্দু ধর্মের তুলনায় খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। এর কোনো মুদ্রিত সংকলন পাওয়া যায়নি। পুস্তকটি বাংলা গদ্যের একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন। একটু নমুনা নেওয়া যাক—

"বলি (বলিরাজা) বরো ধর্মিষ্ঠ ছিলো, মহাদাতা ছিলো যে যাহারে চাহিতো তাহারে তাহা দিতো, একারণ পরমেশর ব্রাহ্মণ রূপ হৈয়া একপদ ভূম চাইলো গিয়া তাহার ঠাই, রাজা কহিলো, দিলাম, শেষ একপদ দিলা প্রথিবীতে একপদ পাতালে আর পদ স্বর্গে, এইরূপে বলি রাজারে ছলিলেন"।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনির কর্মচারীরাও শাসনকর্মের সুবিধার জন্য বাংলাভাষার অনুশীলন করেছিলেন। হালহেড ইংরেজিতে যে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন তার নাম 'A grammer of the Bengal Language' (1778) এই গ্রন্থেই প্রথম ধাতুতে খোদাই করা বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা হয়। এই অক্ষর প্রস্তুত করেন কোম্পানির অপর এক কর্মচারী Charles Wilking। হালহেডের ব্যাকরণের ভাষা ইংরেজি, শুধু দৃষ্টান্তগুলি বাংলা।

বইটি মানোএলের ব্যাকরণ থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। এ সময় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কয়েকটি আইন গ্রন্থ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত হয়। বাংলা জানা ইংরেজ কর্মচারীরাই এই কাজটি করেছিলেন। এ সময়ে কোম্পানি-কর্মচারীদের বাংলা চর্চার মধ্যে ফরষ্টার সাহেবের Vocabulary বা ইংরেজি বাংলা অভিধান (1799-1802 দুই খণ্ডে প্রকাশিত) উল্লেখযোগ্য।

আলোচিত দৃষ্টান্তগুলি প্রত্নতত্ত্বের নজির হিসাবে উল্লেখ্য হলেও বাংলা গদ্যের সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক খুবই কম। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রয়োজনে যে সমস্ত বাংলা গদ্য রচিত হল সাহিত্যের দিক থেকে এগুলি অকিঞ্চিৎকর নয়। আসুন, শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্য এবং রামমোহনের গদ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

১.৩.১ শ্রীরামপুর মিশন

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনারিরা ধর্ম প্রচারের তাগিদে দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের প্রয়োজন বোধ করেন। উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, টমাস প্রমুখের উদ্যোগে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস স্থাপিত হয়। তাঁদের ধারণা ছিল বাইবেল দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে লোকের হাতে পৌঁছে দিলেই মিশনের দরজায় খ্রিস্ট কৃপামৃত পিয়াসি লোকের ভিড় বাড়বে। অবশ্য এঁরা শুধু বাইবেল অনুবাদ করেননি, অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান যেমন, বোপদেবের মুগ্ধবোধ, অমরকোষ, কেরির Sanskrit grammer, এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসের মহাভারত ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত করে প্রচার করেছিলেন। এছাড়া বাল্মীকি রামায়ণ, নানা শাস্ত্র 'সমাচার দর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকাতে প্রচার করেছিলেন। এসব প্রচারের মূলে অবশ্যই উদ্দেশ্য ছিল জনপ্রিয়তা অর্জন, যা তাঁদের ধর্মপ্রচারে সাহায্য করতে পারে। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' নামে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে St. Mathew's Gospel মূল থেকে অনূদিত হয়ে 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নামে প্রকাশ পায়। এই অনুবাদ কর্মগুলি উইলিয়াম কেরির হস্তপ্রসূত; কেরি সাহেব আক্ষরিক অনুবাদেরই সহায়তা নিয়েছিলেন। ইংরেজি বাইবেলের বাক্যগঠনের হুবহু অনুসরণ করতে গিয়ে বাংলা গদ্যের অন্বয় (Syntex) পর্যন্ত গোলমাল করে ফেলেছিলেন। কেরি সাহেবের বাংলা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হয় শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীর বাংলা ভাষা বিশেষত গদ্যচর্চা সে সময় বাঙালিকে গদ্যচর্চায় উৎসাহী করে তুলেছিল। বাংলা গদ্যের ছাঁদ তৈরির ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের এই অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১.৩.২ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিবর্তনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে ইংরেজ কর্মচারীদের শাসনকার্যে প্রধান সমস্যা ছিল ভাষার সমস্যা। এদেশীয় ভাষা না বুঝলে প্রশাসন চালানো কঠিন জেনে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল তরুণ

সিভিলিয়ানদের এদেশের ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, আইনকানুন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালে কলকাতার লালবাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮০১ সালের মে মাসে কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হল, এই বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন উইলিয়াম কেরি; যিনি ইতিমধ্যে বাইবেল অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় বুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। উইলিয়াম কেরির অধীনে বাংলা বিভাগে দুজন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি এবং ছয়জন সহকারী শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু নিযুক্ত হলেন। সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়াতে গিয়ে বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব বোধ করলেন কেরি সাহেব। তাই তিনি নিজে বাংলা গদ্যের বই লিখলেন এবং অন্যান্য পণ্ডিত-মুনশিদের দ্বারা বই লিখিয়ে নিলেন। পণ্ডিত ও লেখকদের উৎসাহিত করতে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষ মারফৎ পণ্ডিত-মুনশিদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করলেন। সে সকল পণ্ডিত-মুনশিগণ সে সময় কেরির অনুরোধে বাংলা গদ্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সৃষ্টির তালিকা এরূপ—

(১) গোলোকনাথ শর্মা— হিতোপদেশ (১৮০২)

(২) তারিণীচরণ মিত্র— The Oriental Fabulist (ঈশপের গল্পের অনুবাদ— ১৮০৩)

(৩) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়— মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)

(৪) চণ্ডীচরণ মুনশি— তোতা ইতিহাস (১৮০৫) (তুতিনামা নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ)

(৫) রামকিশোর তর্কচূড়ামণি— হিতোপদেশ (১৮০৮)

(৬) হরপ্রসাদ রায়— পুরুষপরীক্ষা (১৮১৫)— (বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।)

(৭) কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন— পদার্থতত্ত্ব কৌমুদী (১৮২১) এবং আত্মতত্ত্ব কৌমুদী (১৮২২)

এছাড়া স্বয়ং উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসুর সাহিত্যকর্ম বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) শ্রীরামপুর মিশনের কর্ণধার থাকাকালে বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করলেও সেক্ষেত্রে ভাষার জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার প্রধান অধ্যাপক হয়ে তিনি আরও নিবিড়ভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর নামে দুখানা বাংলা বই পাওয়া যায়— 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। কথোপকথন বইটি দ্বিভাষিক, এক পৃষ্ঠায় বাংলা অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি। বইটির ইংরেজি আখ্যা Dialogues Intended to Facilitate the Acquiring of Bengalee Language. বইটির কয়েকটি প্রস্তাব অবিমিশ্র সাধুভাষা, তবে অধিকাংশই কথ্যভাষা মিশ্রিত। এগুলির নাটকীয় রস অতি চমৎকার। চলতি ভাষায় কেরির যে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তা একজন বিদেশির পক্ষে সম্ভব কিনা তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। গবেষকরা মনে করেন লোকভাষায় দক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ই কেরিকে বইটি রচনায় সাহায্য করেছিলেন। সে যুগের সমাজে স্ত্রীলোকের সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত

পাওয়া যায় 'স্ত্রীলোকে যেতে পারে কথাবার্তা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে। একটি নমুনা দেওয়া যাক—

"১ মা— ওলো, তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে বল শুনি।

২ য়া— আহা, তাহার কথা কহ কেন? এখন আর আমাদের কী আদর আছে? নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে?"

কথ্যভাষায় দুরন্ত অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় নিচের সংলাপে—

"কালিকে ভাই দুপুর বেলা কচকটি লাগালে মাঝ্যা বিটি তাহা কি বলিব" ইত্যাদি।

'ইতিহাস মালা'-র প্রস্তাবগুলিতে প্রায় ১৫০ টি গল্প সংকলিত হয়েছে। কারো মতে কোনো প্রস্তাবই কেরির রচনা নয়, ইনি শুধু সংগ্রহকর্তা মাত্র। নামে 'ইতিহাস মালা' হলেও গ্রন্থটি অনৈতিহাসিক গালগল্পে ভরা। কয়েকটি গল্পের মূল পাওয়া যায় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' 'ভোজপ্রবন্ধ' ইত্যাদি সংস্কৃত গল্পের বইতে। এতে চণ্ডীমঙ্গলের লহনা-খুল্লনার গল্পও আছে। গল্পগুলির গদ্যরীতি সংস্কৃত ঘেঁষা হলেও সহজ সরল ও পরিচ্ছন্ন— 'ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বিবেচনা করিল, আমি ব্যাঘ্রীহীন, ব্রাহ্মণ বিবাহের যোজকতা করে। পরে কহিলেক, হে ঘটক, তুমি আমার বিবাহ দেও— ব্যাঘ্রী না থাকাতে আমি বড় দুঃখে আছি। তুমি আমার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে নষ্ট করিব না।" কেরির সরস মনটিও যেন এই রচনায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। 'ইতিহাস মালা'ই সম্ভবত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গল্পসংগ্রহ। এই দুইখানি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া কেরি ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১) এবং একটি বাংলা ইংরাজি অভিধান (১৮১৮-২৫) সংকলন করেন।

রামরাম বসু (মৃত্যু—১৮১৩) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার সহকারী শিক্ষক, কেরি সাহেবকে নাকি তিনি বাংলা শেখাতেন। তাঁর রচিত দুখানি গদ্যগ্রন্থ পাওয়া যায়— 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২)। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। রামরাম বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ ধুমঘাটের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনের উপাদান সংগ্রহ করেন। ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনায় তিনি কিছুটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তবে গদ্যের অন্বয় বিশৃঙ্খল। বইটির ভাষা সাধুভাষা, পদ্ধতি বর্ণনাত্মক ও আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে বইটি কণ্টকিত।

'লিপিমালা'র উদ্দেশ্য "এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়"-দের সঙ্গে 'এখানকার চলন ভাষার" পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এইবইয়ের ভাষা সরল, ফারসি শব্দ-বাহুল্য হীন ও কথ্যভাষার অনুগামী। বইটিতে অর্ধ-তৎসম শব্দের প্রচুর সাবলীল ব্যবহার রয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু ১৮১৯) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর সর্বাধিক খ্যাতিমান লেখক। ইনি ইংরেজি জানতেন না, ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন রামমোহনের কর্মপন্থার বিরোধী রক্ষণশীল মানসিকতাসম্পন্ন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পূর্বে ইনিই বাংলার যথার্থ ভাষাশিল্পী। সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ছাত্র মার্শম্যান তাঁকে ড. জনসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর গদ্যগ্রন্থে একই সঙ্গে সরল ও পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা এবং স্থানীয় উপভাষার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ামের ছাত্রদের জন্য চারটি গ্রন্থ রচনা করেন— 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২); 'রাজাবলি' (১৮০৮); 'হিতোপদেশ' (১৮০৮); 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (রচনা আনু ঃ ১৮১৩, প্রপ্রঃ ১৮৩৩)। রামমোহনের বেদান্ত চর্চার প্রতিবাদে লেখা 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) পুস্তিকাখানি সম্ভবত তাঁরই রচনা।

'বত্রিশ সিংহাসন' ও হিতোপদেশ' সংস্কৃত কাহিনির সরল অথচ গম্ভীর রূপায়ণ। স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ রচনাকে দুর্বল করেছে। 'রাজাবলি' বাঙালির রচিত প্রথম ইতিহাস। চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তান বিচিত্রবীর্য থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশে কোম্পানি শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিবরণ অতি সংক্ষেপে সারা হয়েছে। আরবি ফারসির প্রচুর ব্যবহার থাকলেও বইটির ভাষা খুব প্রাঞ্জল। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় নানাবিধ তত্ত্বকথা, ভাষারীতি, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদি বর্ণিত। রচনায় সাধু ও কথ্য উভয় রীতির ব্যবহার রয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচনা থেকে সাধু ও কথ্য রীতির নমুনা নেওয়া যেতে পারে—

সাধুরীতি ঃ "এইরূপে রাজা ভর্তৃহরি বন প্রবেশ করিলে পর মালুয়াদেশ অত্যন্ত অরাজক হইল, উজ্জয়িনীর রাজধানী শ্মশান প্রায় হইল। ইহাতে অগ্নিবেতাল নামে এক বেতাল ঐ দেশকে আক্রমণ করিয়া প্রজালোকের দিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।"

সরল ভাষা ঃ "ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, 'তবে কি আজি খাওয়া হবে না, ক্ষুধায় মরিব?' তৎপত্নী কহিল 'মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখি-দেখি হাঁড়িকুড়ি খুদকুড়া যদি কিছু থাকে।"

মৃত্যুঞ্জয়ের ক্লাসিক সাধুরীতিই বিদ্যাসাগরের মধ্যে অধিকতর সুষ্ঠ শিল্পরূপ লাভ করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ই বাংলা সাধুভাষার ভগীরথ। সবশেষে বলা যায়, উৎকর্ষ যেমনই হোক, বাংলা গদ্যের কায়া গড়নের প্রথম পদক্ষেপ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নমস্য অধ্যাপকেরাই গ্রহণ করেছিলেন; এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বাংলা গদ্যের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে।

১.৩.৩ রামমোহন রায়

আধুনিক ভারতের জনক রাজারামমোহন রায় (১৭৭৬-১৮৩৩) বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে প্রগতিশীল মনোভাবের প্রথম সূচনা করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। বাংলা গদ্য সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি হয়তো পুরোপুরি রীতি-বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য সৃষ্টিতে সফল হননি, কিন্তু বাংলা গদ্য ভাষাকে তিনি প্রথম গৃহকর্মচ নির্বাহের বদ্ধতা থেকে বৃহত্তর জ্ঞান চিন্তার জগতে টেনে এনেছেন।

রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনার বশবর্তী হয়েই বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং বিশুদ্ধ শিল্পরস বা সাহিত্যরস সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বহুকাল-প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য দম্ভের মূলে কুঠাঘাত করার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন এবং সর্বসাধারণের মধ্যে তা বিতরণ করেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদগুলি হ'ল— 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৫-১৮১৯) ইত্যাদি। বিতর্কমূলক রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে— 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৮), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮-১৮১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'পথ্যপ্রদান'(১৮২৩), 'সহমরণ বিষয়ক' (১৮২৩) ইত্যাদি। এছাড়াও 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩), 'ব্রহ্মসঙ্গীত' (১৮২৮), 'সম্বাদ কৌমুদী' (পত্রিকা) ইত্যাদি রচনা করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আবার, হিন্দি, ইংরাজি ও

ফারসি ভাষায় তিনি একাধিক মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রামমোহন রায় সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক এবং মীমাংসার বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙালি জাতিতে তিনি হাতে-কলমে বাংলা গদ্য লিখতে-পড়তে শেখালেন। রামমোহনের পূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা বাংলা গদ্যকে শুধুমাত্র কহিনি ও গাল-গল্প প্রকশের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, কিন্তু রামমোহন তাকে যুক্তি-তর্ক-চিন্তার দ্বারা সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তাঁর বাংলা গদ্য পূর্ববর্তী গদ্যের তুলনায় অনেক বেশি ঋজুগতি, তীক্ষ্ণ ও যৌক্তিক পারম্পর্যে সুগঠিত হয়েছে। আধুনিক মনের জটিলতাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে যে আধুনিক মনের উপযোগী ভাষা-বাহনের দরকার— রামমোহন সেই আধুনিক ভাব-প্রকাশক বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। তাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি চিরদিন অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন।

(বিঃ দ্রঃ- বাংলা গদ্য-সাহিত্যে রামমোহন রায়ের দান ও স্থান সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান আহরণের জন্য বাংলা সাহিত্যের যে কোনো ইতিহাস দ্রষ্টব্য।)

১.৪ প্রথম পর্বের বাংলা সাময়িক পত্র

বাংলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ইংরেজি সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে বাঙালি জীবন নিক্ষিপ্ত হল নবজাগরণের অকূল অতল বারিধিতটে, বহুবিধ প্রকাশের দরজা গেল খুলে। বাংলা গদ্যরীতির জন্মের পেছনে যেমন ইংরেজদের ভূমিকা আছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, বিশ্বসাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের যে মাধ্যম, সেই সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে ইংরেজই প্রথম বাংলার সামনে নিয়ে এল। প্রথম যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলো যেমন বাঙালিকে বিশ্ব-বিচিত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তেমনি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ, সমালোচনা, রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা ইত্যাদির রীতির প্রবর্তনার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে গতিশীল করে তুলল। বাংলায় নবজাগরণ সংঘটিত হওয়ার পেছনে যেসমস্ত উপাদান সক্রিয় ছিল, সেকালের সাময়িক পত্রগুলোকেও সেসমস্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে হিকি সাহেব কলকাতা থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্রের প্রকাশ করেন। Bengal Gazette (প্রথম প্রকাশ ২৯-১-১৭৯০) নামের এই পত্রিকায় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের কেচ্ছা-কাহিনি, কোম্পানির অত্যাচার, অনাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকত। ওয়ারেন-হেস্টিংসের রোষদৃষ্টিতে পড়ে হিকি সাহেবের শেষজীবন বড়ো দুঃখে কাটে, পত্রিকাটিও বন্ধ হয়। আরো কিছু কিছু ইংরেজি সাময়িক পত্র অষ্টাদশ শতকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও বাংলা সাময়িক পত্রের অধ্যায় শুরু হয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে। বস্তুত আঠারো শতকের ইংরেজি পত্রিকাগুলো বাংলা পত্রিকার জন্মের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ পায়। ওই বছর এপ্রিল মাসে 'দিগদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা এবং পরের মাসে 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উভয় পত্রিকারই সম্পাদক

ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের পাদরি জন ক্লার্ক মার্শম্যান। যদিও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ দেশীয় পণ্ডিতেরাই মূলত এগুলি পরিচালনা করতেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু এটির জীবনকাল ছিল অতি অল্প।

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রায়ই হিন্দুধর্ম ও সমাজকে অকারণে গালিগালাজ করা হত। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তিহীনতা' প্রবন্ধটির প্রতিবাদ করতে গিয়ে শিবপ্রকাশ রায় ছদ্মনামের আড়ালে রামমোহন রায় প্রকাশ করেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), পত্রিকাটি মাত্র কয়েকমাস টিকেছিল। একই বছরে রামমোহন ও ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যে মিলে 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) পত্রিকা প্রকাশ করে হিন্দুদের প্রতি সমাচার দর্পণের আক্রমণের যথোচিত জবাব দেন। পরে রামমোহনের প্রগতিশীল মতের সঙ্গে রক্ষণবাদী ভবানীচরণের বিরোধ ঘটায় ভবানীচরণ এই পত্রিকা ছেড়ে দিয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২, মার্চ) নামে একটি পত্রিকা বের করেন। এই দুটি পত্রিকাই বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রামমোহনের গম্ভীর গদ্যের বাহন ছিল 'সম্বাদ কৌমুদী', ভবানীচরণের নববাবু বিলাস ইত্যাদি সরস ব্যঙ্গাত্মক গদ্যের বাহন হল 'সমাচার চন্দ্রিকা'; একটি আধুনিকতার পথিক, অপরটি চলছিল চিরাচরিত সংস্কারের পথে।

এই সাময়িক পত্রিকাগুলো ছাড়া প্রথম যুগের সাময়িক পত্রের মধ্যে 'বঙ্গদূত' (সম্পাদক নীলরত্ন হালদার, প্রথম প্রকাশ ১৮২৯), 'পশ্বাবলী' (১৮২২), 'সংবাদ তিমির নাশক' (১৮২৩) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্ররা ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্পাদিত এই পত্রিকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডারে ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক ছাত্র সম্প্রদায়ের সাবলীল সন্তরণে বিদ্যাচর্চার বাহন হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকার একটি ইংরেজি সংস্করণ ১৮৩৩ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ অবধি চালু ছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১)। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের সুযোগ্য সম্পাদনায় পত্রিকাটি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিনটি) এবং পরে ১৪ জুন ১৮৩৯ থেকে দৈনিক রূপে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক কাগজটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে পত্রিকাটির একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হয়। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন কাব্য-কবিতার সন্ধান 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায়ই প্রথম সূচিত হয়। এখানেই নিত্য নতুন করে সংকলিত কবিগান, কবিওয়ালার পরিচয়, ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত, সমসাময়িক ঘটনাবলি ও শিল্প-সাহিত্যের বলিষ্ঠ বিচার প্রথম লক্ষ করা গেল। প্রভাকরকে কেন্দ্র করেই অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন রঙ্গলাল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু। প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালি বার্তাজীবীদের গুরু স্থানীয়। রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরেজ শাসনের সমালোচনা কিংবা স্বজাতি প্রেম ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজ সাহিত্য নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা তাঁর লেখনীতেই প্রথম ফুটে ওঠে। স্বাধীনতার তাগিদটি বোধহয় এই পত্রিকায় ঈশ্বর গুপ্তের জবানিতেই প্রথম অভিব্যক্ত হয়—

"কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলে বলতে হয় ঈশ্বর গুপ্ত রীতিশুদ্ধ প্রাঞ্জল গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে 'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২), 'জ্ঞানোদয়' (১৮৩১) উল্লেখযোগ্য। দুটি পত্রিকাই মাসিক এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামক মাসিক পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। পত্রিকাটি উদয়চন্দ্র আঢ্যের সম্পাদনায় ১৮৪৪ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দৈনিক রূপে প্রকাশিত ছিল।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভার' জন্ম ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। অক্ষয়— ভূদেবের আত্মপ্রকাশের আগেই প্রথম যুগের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস সমাপ্ত হয়েছে। বাংলা গদ্যরীতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় মার্শম্যান সহযোগী পণ্ডিতদের গদ্যশৈলী রামমোহন ভবানীচরণ প্রমুখের হাত বেয়ে ঈশ্বর গুপ্তে এসে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। প্রাঞ্জলতা, বহুমুখিতা ও সৃজনোপযোগী গভীরতায় ওই সময়ের গদ্য শিক্ষিত বাঙালির মানস-বাহন হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি সংবাদ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে যুগের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের সমসাময়িক ধর্ম, রাজনীতি ও সমস্ত সংস্কারান্দোলনের উত্তপ্ত বিতর্কের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টিও সমুদ্ভাসিত। বিতর্কের বাহন হিসাবে গদ্যের ব্যবহার হওয়ায় গদ্যভাষার সরলীকরণের ইতিবাচক ভূমিকাটি সেকালের পত্র-পত্রিকা গ্রহণ করেছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে সেকালের সাময়িক পত্রের ভূমিকা নির্ণয়ে কথাগুলো মনে রাখতে হয়।

১.৫ বাংলা গদ্য ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যাঁর হাত ধরে বাংলা গদ্য, তার প্রথম পদক্ষেপের দিনগুলিতে শৈশব-কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে, তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম সাহিত্য-শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদেশি শাসনযন্ত্রে নিষ্পেষিত, যুগ যুগ সংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতির নবচেতনার উন্মেষ ঘটালে বাংলার রেনেসাঁসের মাহেন্দ্রক্ষণে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। লোকহিত সাধনের উদ্দেশ্যে কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি, নিছক সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর সচেতন উদ্দেশ্য ছিল না। জনকল্যাণমূলক সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাই তাঁকে বাংলা গদ্যেরও সংস্কার সাধন করতে হয়েছিল। পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের নীরসতা এবং কাঠিন্য দূর করে দীর্ঘ বাক্যের জটিলতা ও আড়ষ্টতা পরিহার করে, রামমোহনের যুক্তিশীল গদ্যের বলিষ্ঠতায় কবিত্বের কোমল স্পর্শ যুক্ত করে তিনিই বাংলা গদ্যকে রস নৈপুণ্যে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছেন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হওয়ার সূত্রে সংস্কৃত গদ্যরীতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি সংস্কৃত গদ্যরীতির অনুকরণ করেননি; বাংলা গদ্যের গঠন-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী-সুলভ মনোভাব নিয়ে বাংলা ভাষার গঠন অনুযায়ী সংস্কৃত রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের অনূদিত গ্রন্থগুলিও শিল্পীর সৃজনশীল প্রতিভা-স্পর্শে মৌলিক সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে সাহিত্যিক গদ্যের স্তরে উন্নীত করেছেন— "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী

হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয়ভাব-জননীরূপে মানব সভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়..... তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে। .....বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলি বক্তব্যবিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া ছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। .....ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দরভাবে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। .....বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।" রামমোহন যেমন সাহিত্যের মধ্যে নিজের কিছু পরিচয় রেখে গেছেন, তেমনি বিদ্যাসাগরের গদ্যনিবন্ধাদির মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক পরিচয়টি বিধৃত।

বিদ্যাসাগর-রচিত গদ্যগ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ ঃ বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭); বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (১৮৪৮); জীবন চরিত (১৮৪৯); মহাভারত উপক্রমণিকাভাগ (১৮৪৯, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৬০); বোধোদয় (১৮৫১); সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫১, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৫৩); শকুন্তলা (১৮৫৪); বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব (১৮৫৫); কথামালা (১৮৫৬); চরিতাবলী (১৮৫৬); সীতার বনবাস (১৮৬০); আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৪); ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯); বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (প্রথম পুস্তক ১৮৭১, ২য় পুস্তক ১৮৭৩); প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৬৪, প্রথম প্রকাশ ১৮৯২); স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত (১ম প্রকাশ ১৮৯১)।

নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি বিদ্যাসাগর কর্তৃক বেনামিতে লিখিত ঃ অতি অল্প হইল (১৮৭৩); আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩); ব্রজবিলাস (১৮৮৪); বিনয় পত্রিকা (১৮৮৪); রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী গদ্যরীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঋজুতা, ভারসাম্য, যাথার্থ্য ও শৃঙ্খলাই গদ্যের অন্বিষ্ট হওয়া উচিত, এই বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে ইংরেজি গদ্যের আদর্শকে সামনে রেখে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যের দীর্ঘ সমাস বহুল বাক্যকে ক্ষুদ্রতর বাক্যে বিভক্ত করলেন, পদগুলির মধ্যে ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করলেন, ছেদ চিহ্ন প্রয়োগ করে অর্থসম্পন্ন বাক্যাংশ সৃষ্টি করলেন, ক্রিয়ারূপে ও শব্দে সরলতা আনলেন, অনুচ্ছেদ রচনা করে অর্থমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। তিনিই বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন শিল্পী। বাংলা সাধুগদ্যের কাঠামো কী হওয়া উচিত তা বিদ্যাসাগর স্থির করেন এবং চলতি গদ্যের সম্ভাবনা নিয়েও তিনি পরীক্ষা চালান। তাঁর গদ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের পেলব, মার্জিত, শুদ্ধ, সংযত রসনৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় মনো ভিত্তি সুলভ যুক্তিনিষ্ঠা, পরিমাণবোধ, স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

বিদ্যাসাগর-পূর্ববর্তী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন রায়, ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলাগদ্যকে ভারবহনপটু, দুরুহচিন্তা প্রকাশক্ষম ও বিন্যস্ত করে তোলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিকসুলভ নমনীয়, ক্ষিপ্রচারি, সর্বজন ব্যবহারযোগ্য গদ্যের ধারাবাহিকতাতেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। ঈশ্বর গুপ্তের দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য গদ্যকেই বিদ্যাসাগর দান করলেন স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য। তিনি প্রমাণ করলেন, গদ্যচর্চা সাধনার বিষয়, শব্দ নির্বাচন সতর্ক শিল্পচেতনা নির্ভর। বাংলা পদ্যের মতো গদ্যেরও যে একটা ধ্বনিঝংকার আছে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যে যার আভাস পাওয়া গেছে— তার চরমতম উৎকর্ষ ঘটেছে বিদ্যাসাগরের হাতে। এই অন্তর্নিহিত ধ্বনিঝংকার আবিষ্কারের ফলে ভাব ও ভাষার সুষম মিলনে বাংলাগদ্য সাবলীল, প্রাঞ্জল সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হয়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বাংলা গদ্যভাষায় একটি বাক্য কয়েকটি বাক্যাংশের (ক্লজ) সমষ্টি মাত্র, আবার এই বাক্যাংশগুলি শ্বাস-পর্ব (ব্রেথ-গ্রুপ) ও সার্থ-পর্বে (সেন্স-গ্রুপ) বিভক্ত। তিনি দেখান যে, প্রত্যেক শ্বাস-পর্ব বা সার্থ-পর্ব, বাক্যের পৃথক অঙ্গরূপে, সাধারণ আদ্যক্ষরে স্বরাঘাত-যুক্ত হয় এবং পর্বের অন্য শব্দের স্বরাঘাত (স্ট্রেস) বিলুপ্ত হয়। বাংলা ছন্দের মূলে এই সত্যই ক্রিয়াশীল।" বাংলা ছন্দের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন ও গদ্যে তার প্রয়োগের ফলে যে ধ্বনি সামঞ্জস্য আসে, তাতেই গদ্যের বিশৃঙ্খল রূপের মধ্যে স্থিরতা আসে। তিনি শুধু বাংলা গদ্যকে ভাবপ্রকাশের বাহন করেই তোলেননি, হৃদয়ের গভীরতম আবেগানুভূতির প্রকাশে পদ্যের পাশাপাশি গদ্যের ভূমিকাও যে সমধিক তাও প্রমাণ করেছেন।

বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য উপযুক্ত ছেদ চিহ্নের অভাবে জটিল ও দুর্বোধ্য ছিল। বাংলা গদ্যের নিজস্ব যতি অনুসারে তিনিই প্রথম সজ্ঞানভাবে সুষম বাক্যগঠনরীতি প্রবর্তন করলেন। একটু উদাহরণ নেওয়া যাক— "অনন্তর, তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ! ঐ মালিনী নদীর তীরে আমাদের গুরু মহর্ষী কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে; যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি সংকার স্বীকার করুন। আর, তপস্বীরা, কেমন নির্বিঘ্নে, ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে, ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে।" —এই দীর্ঘ বাক্যে 'কমা', 'সেমিকোলন', 'বিস্ময়বোধক চিহ্ন' ও 'পূর্ণচ্ছেদে'র যথোপযুক্ত প্রয়োগে দুর্বোধ্যতার হাত থেকে ভাবের মুক্তি ঘটেছে। একই বাক্যের মধ্যে উপবাক্যের ব্যবহারে ইংরেজি জটিল বাক্যগঠনরীতিরও প্রয়োগ ঘটেছে। বিদ্যাসাগর তাঁর গদ্যে একদিকে সংস্কৃত শব্দবহুল সাধুরীতি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদি[illegible] উপযোগী অর্থ পরিজ্ঞাপনের জন্য চলিতভাষার স্টাইলকেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" ছদ্মনামে লেখা 'ব্রজবিলাস'-এ এই স্টাইল ধরা পড়েছে। তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দ প্রয়োগ বিদ্যাসাগরের উৎসাহও এখানে লক্ষণীয়। চলিত গদ্যের লঘুরীতি তাঁর দৃষ্টি যে এড়িয়ে যায়নি— এই সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত।

বস্তুত বিদ্যাসাগর "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী"। তিনি বাংলা গদ্যে অন্তর্নিহিত ছন্দস্রোত সঞ্চারিত করেছিলেন, পদবিন্যাসে সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা এনেছিলেন এবং গদ্যরীতির বিচিত্র পরীক্ষা করেছিলেন। বোধোদয়, কথামালা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বিতর্ক পুস্তক, প্রভাবতী সম্ভাষণ— ইত্যাদি গদ্যের নানা রূপ ও রীতির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যক সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যকে দান করেছেন সৌন্দর্য ও কল্পনাধর্মিতা, ধ্বনিরোল ও ছন্দঃস্পন্দ। বাংলা গদ্যের পরবর্তী ঐশ্বর্যের ভিত্তিভূমি বিদ্যাসাগরী গদ্য।

তিনিই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের আদিগঙ্গা-ভগীরথ। তাঁর সুকর্ষিত চেতনা যে নতুন পথের সন্ধান করেছিল সেই পথ ধরেই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে অনেকানেক পদাতিকের আগমন ঘটেছে। বিদ্যাসাগরই তাঁদের পথ প্রদর্শক; আর এসূত্রেই তিনি অর্জন করেছেন কালাতিক্রমণের গৌরব।

১.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য প্রবন্ধ

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালি জাতির মধ্যে আত্মপ্রসারের তাগিদ প্রবল হয়ে উঠল। নবজাগ্রত মনীষা নিয়ে সে নিজেকে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সকল শাখায় ছড়িয়ে দিতে চাইল। বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হল। আধুনিক জীবনের নব নব জিজ্ঞাসা, চিন্তা, সমাজকথা, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনাদর্শ— সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে কোনো না কোনো দিক দিয়ে অভিভূত করল। আর এই চিন্তার প্রতিফলন ঘটল প্রবন্ধে-নিবন্ধে। চিন্তাশীল প্রবন্ধ সাহিত্য যা নবজাগ্রত জাতিকে সাবালকত্ব দান করেছিল, তার যথার্থ জয়যাত্রা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শুরু হল। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান প্রাবন্ধিকও বটে। তিনিই তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রধান নিয়ামক শক্তি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ, ধর্ম, মনন— এ সমস্ত কিছুর মাধ্যমে নব্য বাংলা ও বাঙালির চেতনাকে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। আর এই কাজে তিনি প্রবন্ধকে তাঁর প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। বাঙালির চিন্তার রাজ্য যাতে প্রসারিত হয়, জ্ঞান ও কর্মে যাতে নতুন উপলব্ধি ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। লঘু অথবা গুরু যে কোনো ধরনের প্রবন্ধই যে রচনাগুণে সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে বঙ্কিমই তা প্রথম নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মকথা, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর লঘু ও গুরু, সাহিত্যধর্মী এবং চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধগ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ— 'লোকরহস্য' (১৮৭৪); 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫); 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫); 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৮৬); 'সাম্য' (১৮৭৯); 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯); 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬); 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ-১৮৮৭); 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮); 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য় ভাগ ১৮৯২); 'শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা' ('প্রচারে' ১২৯২ ও ১২৯৫ সালে মুদ্রিত)।

নানা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁর যুক্তি আশ্রয়ী সিদ্ধান্ত, মননশীলতা এবং সাহিত্যগুণ— এই তিনের সমন্বয় ঘটেছে। নানা তত্ত্বকথা ও তথ্যকে তিনি প্রবন্ধে স্থান দিয়েছিলেন, তবু তাঁর কোনো আলোচনাই নীরস তথ্য বিবৃতিতে পরিণত হয়নি। তবে সাহিত্য সমালোচনা, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনা এবং ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যানে বঙ্কিমের শিল্পিমানস অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করেছিল। এবার বঙ্কিম-প্রবন্ধের প্রধান-প্রধান ধারাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ঃ

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। সাহিত্য সমালোচনার প্রচলিত ধারার গুণগত সমুন্নতি সাধনেও বঙ্কিমের অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক যুগের সাহিত্যিক যেমন— ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ এবং তাঁদের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় বঙ্কিম যেমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি প্রাচীন-সাহিত্য এবং সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারেও রসদৃষ্টির গভীরতার প্রমাণ দিয়েছেন। গীতিকাব্য সম্পর্কিত আলোচনায় নাটক ও উপন্যাসের সঙ্গে গীতিকবিতার পার্থক্য বিচারে তিনি যে সমস্ত সূত্র নির্দেশ করেছেন, তা অদ্যাবধি প্রাসঙ্গিক।

আলোচনা পদ্ধতির দিক থেকে তিনি বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গির বিরোধীই ছিলেন। খণ্ডিত ধারণা সৌন্দর্য উপলব্ধির অন্তরায়, তাঁর মতে সমগ্রের বোধেই সৌন্দর্য উপলব্ধি সম্ভব। এই সাঙ্ঘটিক পদ্ধতি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এক প্রধান উত্তরাধিকার। সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্কিম স্বাভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্যসৃষ্টির মেলবন্ধনকেই সাহিত্যের প্রাণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সৌন্দর্যসৃষ্টিই যে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের উচ্চারণ দ্বিধাহীন, কিন্তু নীতিশিক্ষার প্রশ্নটিও তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে নীতিশিক্ষা দান সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য। উপদেশ দানের মাধ্যমে পাঠককুলকে নীতিজ্ঞ করে তোলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নীতি ও ধর্মবোধের প্রতি পাঠকদের আসক্ত করে তোলাই তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য। রসবাদী সমালোচনা পদ্ধতি পরিহারের পক্ষে তিনি মত প্রদান করেছেন। সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিতে ইংরেজি সমালোচনা পদ্ধতির প্রতি বঙ্কিমের পক্ষপাত এবং অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে।

চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধ ঃ

জ্ঞানচর্চামূলক চিন্তামুখ্য প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তাগত মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি ইউরোপীয় দার্শনিক কোঁতের সমর্থক ছিলেন এবং নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠেছিলেন। রুশো, বেন্থাম, মিলের চিন্তাধারার প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছিল। এই সমস্তের প্রভাবে তিনি 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে সমাজবাদের পক্ষে মতপ্রদান করেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম সমাজতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেন। তবে কার্ল মার্ক্সের প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়নি বলেই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ওয়েব-সাইমন প্রমুখের মতবাদের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য পরিণত বয়সে তাঁর মতবাদ পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি গীতার মর্মবাণীর দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং মনুষ্যত্বের আদর্শ হিসাবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি— এই তিনের বিকাশ ও সমন্বয়কে প্রতিষ্ঠা দেন। 'মনে কোন বাসনা না রেখে কর্ম করে যাওয়া এবং সর্ব কর্মফল ভগবানে অর্পণ করা' হয়ে দাঁড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত নতুন জীবনাদর্শ।

তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের এক বড়ো উপাদান পৌরাণিক ঐতিহ্যকে যুক্তির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে দেখা। এই বিষয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। ভক্তি ও অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা চালিত হয়েই কৃষ্ণকে অনুধ্যান করতে এতদিন ভারতীয় মন অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অনৈসর্গিকতা ও অলৌকিকতাকে বর্জন করে যুক্তির

দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে এক বৃহৎ মানবতার আদর্শের পটভূমিতে কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং এ কাজ তিনি করেছেন ইউরোপের Neo-humanism-এর মানদণ্ডে। বঙ্কিমের ইষ্টদেবতা শ্রীমদ্ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণের বল্লবীপ্রিয় কৃষ্ণ নন— মহাভারত-মহানাট্যের সূত্রধার পার্থসারথি। কৃষ্ণের জীবনাদর্শের প্রচ্ছায়ে বাঙালিকে তিনি নতুন জীবন-প্রত্যয় দান করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ক প্রবন্ধ ঃ

এই ধরনের প্রবন্ধ রচনায় বঙ্কিম সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত ভারত তথা বাংলাদেশের বীর্যহীনতা বিষয়ে যেসব কলঙ্কের অভিযোগ করা হয় তার সত্যতা নির্ণয় এবং তার কারণ অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। ক্রমবিকাশের সূত্র নির্ণয় এবং তার ব্যাখ্যাই যে ইতিহাসবোধকে সম্পূর্ণতা দান করতে পারে— এ ধারণা তিনিই এ দেশে প্রথম প্রচার করেন। বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায়ও তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো জাতির ইতিহাস যে রাজন্যবর্গের তালিকা মাত্র নয়, সেই জাতির নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ— বঙ্কিমই তা প্রমাণ করেন। দেশ এবং জাতির ইতিহাস বিচারের প্রণালিতে তিনি ছিলেন সমকালীন ঐতিহাসিকদের অনুসারী।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটু স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবিদার। লোকরহস্যে বঙ্কিমচন্দ্র হালকা চালে আখ্যানের ঢঙে অনেক গুরুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এতে সমাজ, শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রনীতির অসংগতি কৌতুকরসের মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে। চিন্তাকে এখানে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে গুরুতর তত্ত্বকথাও সরস এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। অসংগত কল্পনা, উদ্ভট পরিস্থিতি ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন এসব রচনায় হাস্যরস পরিবেশন করেছে। বিজ্ঞান রহস্য নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে বিজ্ঞানের কথাও বঙ্কিমের হাতে সরস, পরিচ্ছন্ন, সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর বাংলা সাহিত্যের একটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ গ্রন্থ। ইংরেজ-সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইন্‌সির 'Confessions of An English Upium Eater'-এর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করেন। অবশ্য রচয়িতা দুজনের মন ও মেজাজে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, অপ্রিয় সত্যভাষী ব্যক্তিটির মধ্যে বঙ্কিমের ব্যক্তিচিত্তের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। কমলাকান্তের দপ্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই গ্রন্থকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন। এখানে তিনি ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজের মনের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। কামলাকান্তের মাধ্যমে বঙ্কিমের নির্জন ব্যক্তিসত্তার আর্তি এতে ধ্বনিত হয়েছে। এর রচনারীতিও কৌতূহলোদ্দীপক। এতে গল্পরস আছে, গীতকবিতার সুরমূর্ছনা আছে, আছে নাটকীয়তা। এমনকি রচনা সাহিত্যের ব্যক্তিগত লক্ষণও এতে অপ্রত্যক্ষ নয়। এই গ্রন্থের কিছু রচনা রূপকধর্মী ও ব্যঙ্গাত্মক। বিদ্রূপাত্মক ভাষার মাধ্যমে ও উদ্ভট কল্পনাবিলাসে এখানে সমাজের বিচিত্র অসংগতি এবং জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে।

বস্তুত বঙ্কিমের আবির্ভাবে প্রবন্ধ সাহিত্যে চিন্তাপ্রধান এবং রসপ্রধান উভয় ধারার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে অন্য আর কোনো ব্যক্তি বঙ্কিমের মতো বাঙালি জীবনের গভীরে নিজের মন, মনন ও ব্যক্তিত্বের চিরস্থায়ী স্বাক্ষর মুদ্রিত করতে সক্ষম হননি। সর্বোপরি বঙ্কিম শুধু নিজেই প্রবন্ধ রচনা করে বাঙালির চিন্তবিকাশে সাহায্য করেননি, তাঁকে ঘিরে এক বুদ্ধিমান লেখক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল এবং তাঁদের হস্তস্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এই উত্তরাধিকারেই প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের সফলতার স্বাক্ষরটি মুদ্রিত হয়ে আছে।

১.৭ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা গদ্যসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-উত্তর ব্যাপারটি শুরু হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের মধ্যেই। সেই অর্থে রবীন্দ্র-উত্তর পর্ব বিষয়টি আক্ষরিক অর্থে কালগত বিভাজন নয়, এটি মুখ্যত ভাবের উত্তরণের বিষয়। আর সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের বিবর্তনও ঘটতে থাকে, বিশেষত চলিত গদ্যের বিবর্তন যার সম্ভাবনা বিশ শতকের প্রথম থেকেই স্পষ্ট হচ্ছিল।

রবীন্দ্র-পরবর্তী সময় মোটের ওপর ১৯২৩-এর 'কল্লোল'-গোষ্ঠী দিয়ে শুরু করলেও সেই আলোচনার শুরুতে এসে যায় আরও দুটি নাম— মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ও নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬)। মোহিতলাল প্রথমদিকে গদ্যচর্চায় সাধুরীতি অবলম্বন করলেও এবং কিছু পরিমাণে চলিত বিরোধী থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁকেও চলিত রীতি আশ্রয় করতে দেখা যায়। আর সাহিত্য রচনার দিক থেকে প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেনের সাহিত্য-আসরের সভ্য, তারপর মানসী-র দলে। এইসময়ের একটি প্রবন্ধ 'বিজয়িনী'— যেখানে রবীন্দ্র-কবিতার রসাস্বাদন করছেন। এরপর তাঁকে দেখা যায় ভারতী-র বৈঠকে। তখনও তিনি রবীন্দ্র-অনুগত। এরপরই অল্পকালের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে তাঁর মত হঠাৎই বদলে যায়। এরপর তিনি ভারতী-র আসর থেকে ক্রমে দূরে সরে তরুণ 'অতি-আধুনিক' লেখকদের দলে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁর কিছু বিশিষ্ট কবিতা 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর তাঁর রবীন্দ্র-বিমুখতা নতুন রূপ ধারণ করল। তাঁর প্রকাশস্থল হল 'শনিবারের চিঠি', কেননা 'অতি-আধুনিকেরা' ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, ফলত মোহিতলালের উষ্মা রবীন্দ্রনাথ থেকে অতি-আধুনিকদের ওপর গিয়ে পড়ল। 'ভারতী'-র আসরে মোহিতলাল প্রথম থেকেই কবি ও সমালোচক রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর 'মাসকাবারি' (ভারতী, অগ্রহায়ণ ও মাঘ ১৩২৬) প্রবন্ধগুলি চলিত ভাষায় লেখা, ভারতী-তে প্রবন্ধ রচনার সময় থেকে তিনি 'শ্রীসত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, কারণ তাঁর মতে- 'সত্যসুন্দরের প্রচারই হচ্ছে ক্রিটিকের আসল কাজ।' তবে সমালোচক মোহিতলালের প্রবন্ধগুলি সাহিত্য সমালোচনা হিসেবে কতদূর মূল্যবান সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আধুনিক সমালোচকেরাও।

নজরুল ইসলাম প্রধানত গদ্য শিল্পী নন। যদিও তিনি তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন— 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'। প্রকাশিত হয়েছিল তিনটি গল্পগ্রন্থ— 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদনা' ও 'শিউলিমালা'। এছাড়া অসংখ্য প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এসবের শৈল্পিক মূল্য যাই হোক না কেন বাংলা চলিত গদ্যের ইতিহাসে

রবীন্দ্র পরবর্তী পর্বের আগেই তিনি মৌলিকত্ব নিয়ে আসেন। কাব্য-ভাষায় যেমন ঝঙ্কার তুলে বাঙালি-পাঠককে বিস্মিত করেছিলেন, একই ধরনের গদ্যশৈলী ব্যবহার করলেন গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের পাতায়। সেই গদ্যে প্রকাশ পেল একাধারে পরাধীনতার জ্বালা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, ক্রোধ, অসন্তোষ এবং একই সঙ্গে দৃঢ়তা ও ভয়লেশহীন স্পষ্টবাদিতা এল সেই ভাষায়। তাঁর লেখাই হয়ে উঠল তাঁর বিদ্রোহের হাতিয়ার, প্রতিবাদের স্বর— আর তা প্রায় সর্বাংশেই চলিতের আধারে। প্রবন্ধের গদ্য তো বটেই, গল্প-উপন্যাসের ভাষাতেও তা বাস্তবায়িত হল, যেহেতু তাঁর অধিকাংশ লেখাই 'পল্টনে'র কাহিনি অবলম্বনে, তাই এই ধরনের লেখার ভাষায় বা গদ্য-শৈলীতে নান্দনিক সৌন্দর্যের চেয়ে উন্মাদনা তৈরির চেষ্টাই ছিল প্রবল। তাই ব্যবহৃত শব্দের গায়ে লাগিয়ে দিতেন বিক্ষোভ, বৈষম্য, অসাম্যের রং। এই ভাষার জেরেই 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী'— পত্রিকাগুলিও সকলের পত্রিকা হয়ে উঠেছিল।

'কল্লোল'- গোষ্ঠী কাব্য বিষয়ে যে-অর্থে রবীন্দ্র-বিরোধিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন, সে-অর্থে গদ্যরীতি-কেন্দ্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাননি। তাঁরা তাঁদের সময়ের দিকে এতটাই নজর দিয়েছিলেন যে বিষয় ছাপিয়ে গদ্যভাষার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রবণতাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াস সে অর্থে পাওয়া যায় না। তাই 'কল্লোল'-এর পাতায় সাধুগদ্যের বিষয় যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি চলিত গদ্যেরও। তবুও চলিত গদ্যের বিবর্তনে কল্লোলের কাল এক বিশেষ গুরুত্ব পায় যে কারণে তা হল— বিষয়ের দিক থেকে তাঁরা যেমন যে-কোন নিষেধের বেড়া ভাঙতে পেরেছিলেন, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে শব্দ-নির্বাচনে ছিলেন দ্বিধাহীন। শুধু 'কল্লোল' নয় ১৯৩১-এর 'পরিচয়' পর্যন্ত সাময়িক পত্র কেন্দ্রিক যে-কোন সাহিত্যিক আন্দোলন সম্পর্কেই এ কথা খাটে। কেন-না এসব আন্দোলনের মূলে ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্য-আন্দোলনের অভিঘাত। তাই 'কল্লোল'-এর দীনেশ দাশ থেকে 'পরিচয়'-এর বুদ্ধদেব বসু— সর্বত্রই একইসঙ্গে অবস্থান করে সাধু গদ্য, আলঙ্কারিক চলিত গদ্য ও ভারহীন চলিত গদ্যের 'খট্‌খটে আধুনিকতা'। এরপর ১৯৩০, ১৯৪০-এর, 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'দেনা', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর'— একাধিক পত্রিকায় চলিত গদ্য ছাপা হয়েছে অবাধে। ক্রমান্বয়ে সাধু গদ্যকে পেছনে ফেলে চলিত গদ্য স্থান করে নিয়েছে আধিপত্যের আসনে।

তিরিশের দশকে অধিকাংশ জনপ্রিয় লেখকই কথাসাহিত্যে সাধু-চলিতের উভয়রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য মনীন্দ্রলাল বসু ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ধারায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এসেছেন শরদিন্দু বন্দ্যো পাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সহ অনেকেই। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ। মনীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬)-র ছোটগল্প (উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন 'মায়াপুরী' ১৯২৩; 'রক্তকমল'-১৯২৪; 'কল্পলতা'-১৯৩৫; 'ঋতুপর্ণ-১৯৩৭ ইত্যাদি) এবং উপন্যাসের (উল্লেখযোগ্য 'রমলা'-১৯২৩; 'জীবনায়ন'-১৯৩৬; 'সহযাত্রিণী'-১৯৪১ প্রভৃতি) গদ্য রচনায় ঘরোয়া কথাবার্তার পাশাপাশি শিক্ষিত সমাজের মার্জিত রুচির ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের প্রয়োজনে বিশেষত মার্জিত চরিত্রের ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য সঙ্গীত জগত এমনকি ফারসি সাহিত্যের ভাষাও এসেছে। বর্ণনা অংশে লেখক ব্যবহার করেছেন কলকাতার আদর্শ কথ্য ভাষা। তৎকালীন পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নব্যযুবক সম্প্রদায়ের ভাষা-ব্যবহারের জগত তাঁর রচনার বিশেষ গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) অজস্র গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যে 'নৈসর্গিক রোমান্টিকতা ও মানবজীবনের স্নিগ্ধতা' সাধুর তুলনায় চলিতরীতিতে অনেক বেশি সার্থক হয়েছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) থেকে 'ইছামতী' (১৯৫০) যেন সেই ক্রম-উত্তরণের ইতিবৃত্ত। তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছে 'মেঘমল্লার' (১৯৩১), 'কিন্নর দল' (১৯৩৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ। তাঁর লেখায় চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা-ব্যবহার, সাধারণ লোক প্রচলিত শব্দ ব্যবহার সরল গদ্যরীতি তৈরি করেছে।

এই পর্যায়ে চলিত গদ্যের বিকাশে স্বতন্ত্র ও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সংস্কৃত জটিল শব্দবন্ধ ও তার মধ্যে নিহিত ভাষার গূঢ় ব্যঞ্জনার সফল প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন চলিত গদ্যের মধ্য দিয়ে। তিনি চলিত রীতিতে সংযুক্ত করেছিলেন সাধুগদ্যের দৃঢ় ভাবগাম্ভীর্য। সাহিত্যের তত্ত্ব ও তথ্যের ভার বহন ক্ষমতা যে চলিতেরও আছে— তা প্রমাণ করলেন সুধীন্দ্রনাথ (১৯০১-১৯৬১)। উল্লেখ্য, 'স্বগত' (১৯৩৮)-এর প্রবন্ধ, কিছু বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। গদ্যরীতিতে প্রমথনাথ চৌধুরীকে অনুসরণ করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর থেকেও বেশি অন্নদাশঙ্কর রায়। আর 'হুতোমী' ভাষার সরসতার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে রম্যরচনায় চলিত গদ্যের সরস রূপ তৈরি করলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী।

তিরিশের সেইসব অমর কথাশিল্পী— অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট উজ্জ্বল হলেও চলিত গদ্য নির্মাণের আসরে তাঁরা উল্লেখমাত্র।

চল্লিশের দশকের তরুণ-কথাসাহিত্যিক-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ তাঁদের গদ্যচর্চায় বাংলা সাহিত্যে ক্রমে চলিতের একাধিপত্য গড়ে তুললেন।

পঞ্চাশের পরবর্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যে সাধু রীতি ক্রমে হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী নিদর্শনের তালিকা মাত্র। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় ধরা পড়ে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রচনায় রোমান্টিক স্বপ্নময়তা তার ভাষাবাহনকেও চালিত করে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা ঝরঝরে; তিনি এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি ভাষা-ব্যবহারে যা সাধারণ পাঠককে দূরে সরিয়ে দেবে।

শেখর বসু, সমরেশ মজুমদার, তপোবিজয় ঘোষ, শৈবাল মিত্র, ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী— এরকম অজস্র নাম পাব যাঁদের হাতে বাংলা গদ্য পরীক্ষিত ও নির্মিত হয়ে চলেছে। আজ বাংলা গদ্যসাহিত্য যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে বিষয়-আশয়ের দিক থেকে যেমন উন্মুক্ত প্রাঙ্গন বিরাজ করেছে, তেমনি ভাষা-ব্যবহারেও এসেছে কথারীতির বাঁধভাঙা জোয়ার— ঠিক যেমনটি বহুপূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— "....বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী— একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা; আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চলিতভাষা। ....রূপকথায় শুনেছি সুয়োরাণী ঠাঁই দেয় দুয়োরাণীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরাণী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে। ....গল্পের শেষ

অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।" (বাংলা ভাষা-পরিচয়। বিশ্বভারতী। ১৯৩৮)

এই আলোচনায় প্রায় সুদীর্ঘ নব্বই বছরের বংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তন সংক্ষিপ্ত আকারে ধরতে চাওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সব সাহিত্যিককে এখানে আনা সম্ভব হয়নি। বিশেষ কতকগুলি ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যকে যা বুঝতে কিছুটা সহায়ক হবে।

১.৭.১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ যেমন সহজাত প্রতিভাবলে সাহিত্য জগৎ থেকে চিত্রশিল্পের জগতে প্রবেশ করেছিলেন, অনেকটা সেভাবেই চিত্রশিল্পের জগৎ থেকে সাহিত্যজগতে পা রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। ঝোঁক পড়ে সঙ্গীতচর্চা ও চিত্রশিল্পের অনুশীলনে। পাশ্চাত্য রীতিতে অনুশীলন শুরু করেও ক্রমে অনুরক্ত হন দেশীয় চিত্রাঙ্কনরীতিতে— প্রতিষ্ঠা হয় আধুনিক ভারতীয় শিল্পের। আর এই চিত্রশিল্পীর তুলির টান নতুন রস সঞ্চারিত করল তাঁর রাজপুত-কাহিনিতে, মেয়েলি ছড়া ও ব্রতকথা সংগ্রহে। অবনীনাথ সাহিত্যের দরবারে প্রথম দেখা দিলেন পুরানো রূপকথাকে নতুন রঙে রাঙিয়ে 'শকুন্তলা' (১৮৯৫) নিয়ে। এরপরই প্রকাশিত হয় 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬)। আলপনা চিত্রের সন্ধানে তাঁর শিল্পীমন হানা দিল ব্রতকথার অন্দরমহলে, প্রকাশ পেল 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯)। অল্পবয়সীদের জন্য লেখা 'রাজকাহিনী' (১৯০৯)-র গল্পগুলিও এক নতুন প্রবাহ আনল। মোগল-রাজপুত চিত্র অবনীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেয় রাজপুত-কাহিনিতে। রূপকথার ঢঙ ও কথকতার মাধুর্য মিলে তৈরি এই কাহিনিগুলি দুইখণ্ড 'রাজকাহিনী'-তে সংকলিত (প্রথম খণ্ড ১৯০৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩১)। রাজপুত কাহিনি থেকে লেখক পৌঁছলেন 'ফ্যাণ্টাসি'র জগতে— ইতিহাস-রূপকথা, রোমান্স মিলিয়ে মিশিয়ে অদ্ভুত ও বিচিত্র 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৯১৬), কর্তা খাতাঞ্চি ও তার পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠা এই কাহিনিও ছোটদের জন্যই লেখা যাকে সুকুমার সেন বলেছেন 'শিশুমানসিক উপন্যাস'। মানুষের ভূমিকায় পশুপাখিকে এনে একেবারে কাব্যের ঢঙে লেখা কাব্য-গল্প 'আলোর ফুলকি' গ্রন্থাকারে প্রকাশত হয় ১৯৪৭-এ (প্রথম প্রকাশ ভারতী, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৩২৬)। বুড়ো-আঙুলের আকার-প্রাপ্ত একটি বালক যে হাঁস-সারসের মানসযাত্রার সহচর, তার উত্তর-প্রয়াণের কাহিনি লেখক বয়ন করেছেন অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভূগোলকে কেন্দ্র করে, নামকরণ করেছেন 'বুড়ো আংলা' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৩৪)। এছাড়াও তিনি কিছু অভিনব গল্প-চিত্র তৈরি করেছেন, যা সংকলিত হয়েছে পথে-বিপথে' (১৯১৯)-র 'নদীনীরে' অংশে। লেখকের স্বাস্থ্যের কারণে কিছুদিন স্টীমার ভ্রমণের যে অভিজ্ঞতা হয় তা কাজে লাগিয়ে 'ভারতী'-তে ধারাবাহিক এই চমৎকার ও অভিনব গল্পচিত্রগুলি লেখেন। এখানেও শিল্পীর দক্ষতা চোখে পড়ে। এগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি গল্প 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়েছিল, উল্লেখ্য, 'কোট্‌রা' (আশ্বিন, ১৩২৬), 'আলো-আঁধারে' (কার্তিক, ১৩২৬) প্রভৃতি। এইসব গল্পে কখনও বাস্তব জীবন থেকে আহৃত কাহিনিও স্থান পেয়েছে। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীমন যেমন মিশিয়ে দিয়েছিলেন এইসব সাহিত্যকর্মে, তেমনি শিল্প ও চিত্রকলা সম্পর্কেও কিছু কিছু প্রবন্ধ

'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কি ও কেন' (ভারতী ১৩১৫)। এছাড়া কিছু প্রবন্ধ 'ভারত-শিল্প' (১৯০৯) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসেবে ১৯২২-২৭ সময়কালে তিনি যে-সকল প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করেছিলেন সেগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১) নামে সংকলিত হয়। এরই কয়েকটি প্রবন্ধের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'শিল্পায়ন' (১৯৫৫) নামে। 'বাংলার ব্রত'-কেও আমরা শিল্পচিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধের আলোচনাতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। সংগৃহীত শতাধিক আলপনা নক্‌শা ও তাদের সৃষ্টির মূলে যে মেয়েলি ব্রতকথার উপস্থিতি— এসব নিয়ে লেখকের মনোজ্ঞ আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ শেষজীবনে তিনখানি আত্মকাহিনী-নির্ভর গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রথম দুইখানি গ্রন্থ পারিবারিক স্মৃতিকথা-নির্ভর 'ঘরোয়া' (১৯৪১) ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) শ্রীমতী রানী চন্দের সহযোগিতায় লেখা। তৃতীয়টি শৈশবস্মৃতি অবলম্বনে সহজ-সরল ভাষায় কল্পনার দোলায় রচিত 'আপন কথা' (১৯৪৬)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা-রীতি ঃ

গোড়ার দিকের গম্ভীর রচনায় বিশেষ করে শিল্পতত্ত্বের প্রবন্ধে অনেক সময় সাধুভাষা লক্ষিত হয়। (এই ধরনের রচনার মধ্যে প্রথম 'দেবী প্রতিমা'- 'ভারতী' শ্রাবণ ১৩০৫)। তবে অবনীন্দ্রনাথের লেখায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'চলিত ভাষার সহজ ভঙ্গির সরল প্রকাশ।' তাঁর নিজস্ব রচনারীতি নিতান্তই সরল কথ্যভাষা-নির্ভর মেয়েলি ঢঙের। কিন্তু এই ভাষারীতিতে শক্তি ও সৌন্দর্য যুগিয়েছে শিল্পীমনের সংবেদনশীল সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি। তাই লেখকের সাহিত্যকর্মে বিষয় ও ভাষা একত্রে অখন্ড রূপ ধারণ করেছে। 'ভারতী'-র আসরে যেসকল তরুণ ও নবীন লেখক ক্রমে সৃষ্টিসার্থকতা লাভ করেছিলেন তাঁদেরই একজন 'অবন ঠাকুর'। তাঁর গদ্য সম্ভার যেন রঙ-তুলির টানে 'লেখা ছবি'।

১.৭.২ অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রবন্ধও যে উৎকৃষ্ট শ্রেণির আর্ট হতে পারে, তার বৈচিত্র্য অশেষ— এমনটাই বিশ্বাস করতেন অজস্র প্রবন্ধের স্রষ্টা অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৯০৪ সালে উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করায় গোড়ার দিকে বাংলা ও উড়িয়া দুই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করলেও ক্রমে বাংলার দিকেই ঝোঁক পড়ে। প্রবন্ধ দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীকালে ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা রচনাতেও অভিনবত্ব অর্জন করেছিলেন। যতদূর জানা যায় তাঁর প্রথম গদ্য রচনা 'ভারতী' ১৯৩১-এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর-মূল্য'-এর প্রশংসাসূচক আলোচনা। প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'তারুণ্য' (১৯২৮)। 'বিচিত্রা'-য় প্রথম প্রকাশিত ইউরোপ-ভ্রমণকাহিনি 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১) তাঁকে গদ্যশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। সমসাময়িক ঘটনা থেকে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ এই সবকিছুকে আত্মস্থ করে প্রবন্ধের যে ভাণ্ডার নির্মাণ করেছেন, তার কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত— 'ইশারা' (১৯৪২), 'বিনুর বই' (১৯৪৪), 'জীয়নকাঠি' (১৯৪৯), 'দেশকাল পাত্র' (১৯৪৯), 'প্রত্যয়' (১৯৫১), 'আধুনিকতা' (১৯৫৩), 'কণ্ঠস্বর' (১৯৫৭) ইত্যাদি।

প্রবন্ধ রচনার আর্ট অন্নদাশঙ্কর শিখেছিলেন প্রমথনাথ চৌধুরীর কাছে। পরবর্তী পর্যায়ে চার্লস ল্যাম্ব, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, ভার্জিনিয়া উলফ, মঁতেন— এঁদের রচনার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ বিষয়েও স্থান পেয়েছেন বহু বিদেশি স্রষ্টা— 'কবিগুরু গ্যেটে' (১৯৪৯), 'অন্যতম গুরু টলস্টয়' (১৯৭৮) প্রভৃতি। ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি— এসব বিষয়েও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা' (১৯৭২) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ইতিহাসের পর্বান্তর অনুসারে সংস্কৃতির স্বরূপ যেমন অনুধাবন করতে চেয়েছেন এখানে, একই সঙ্গে প্রাবন্ধিক-মনন থেকে জেগে ওঠা নানা প্রশ্ন অনুরণিত করতে চেয়েছেন পাঠক-হৃদয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন "একমাত্র প্রেমই জয় করতে পারে প্রলয়কে। যদি হিংসা প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে ওঠে।" মানবতাবোধে এই গভীর প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে 'সংস্কৃতির সঙ্কট' (১৯৮৪) প্রবন্ধে।

উপন্যাস রচনাতেও তিনি সমধিক মনোযোগী। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা 'সত্যাসত্য' শীর্ষক উপন্যাস-ষটক— 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২), 'অজ্ঞাতবাস' (১৯৩৩), 'কলঙ্কবতী' (১৯৩৪), 'দুঃখমোচন' (১৯৩৬), 'মর্ত্যের স্বর্গ' (১৯৪০), 'অপসরণ' (১৯৪২)। এছাড়া অন্যান্য উপন্যাস— 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), 'অসমাপিকা' (১৯৩৯), 'পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩), 'না' (১৯৫১), 'কন্যা' (১৯৫৩) ইত্যাদি।

ছোটগল্প গ্রন্থ রচনাতেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৩৪), 'মন পবন' (১৯৪৬), 'যৌবনজ্বালা' (১৯৫০), 'কামিনীকাঞ্চন' (১৯৫৪) ইত্যাদি। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রাখী' (১৯২৯), এর পর প্রকাশিত হয় 'বসন্ত' (১৯৩২), 'কালের শাসন' (১৯৩৩), 'কামনা পঞ্চবিংশতি' (১৯৩৪), 'নূতনা রাধা' (১৯৪৩), এছাড়া দু'টি ছড়ার বই প্রকাশিত হয়— 'উড়কি ধানের মুড়কি' (১৯৪২)ও 'রাঙা ধানের খৈ' (১৯৫০)।

ভাষারীতি ঃ

অন্নদাশঙ্করের চেতনার জগৎ যেমন পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ, তাঁর প্রবন্ধের ভাষাও তেমনই। নিপুণভাবে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসের পর্বান্তরকে প্রদক্ষিণ করেছেন আর একান্ত সহজ গদ্য ভঙ্গিতে তা প্রকাশের সময় কোথাও কোথাও শব্দচয়নে জাগিয়ে তুলেছেন পদ্যের সরলতা। কিন্তু সেই সরলতায় কোনভাবেই সীমায়িত হয়ে যায় না তাঁর চিন্তা-চেতনার বিস্তীর্ণ পরিসর। প্রথম কবিতার বইতে অধিকাংশ স্থলে রবীন্দ্রনাথের মক্‌শ, বিশেষ করে ছন্দে, তবে পরবর্তীকালে ছড়ার ছাঁদে ও ছড়ার ভাবে কবিতা রচনায় তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

'সমসাময়িক সমস্যা ও সম্ভবপর সমাধান' নিয়ে যেসব 'ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা' অন্নদাশঙ্করের লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছিল, তারা কখনোই ভাষার ভারে ভারাক্রান্ত করে তোলে না পাঠক মনকে। এখানেই লেখকের সার্থকতা। এই সার্থক প্রবন্ধ-শিল্পীর তিরোধান ঘটে ২০০৩ সালে।

১.৭.৩ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একদা যেসব নবীন প্রবন্ধ-লেখকগণ সবুজপত্র-গোষ্ঠীর অন্তর্গত বা প্রমথনাথ চৌধুরী প্রভাবিত ছিলেন, পরবর্তীকালে স্বচ্ছ চিন্তা, পরিচ্ছন্ন রচনা, উপস্থাপনার ঋজুতা ও অন্তরঙ্গতা দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা প্রস্তুত করেছেন তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬২)। বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁর সৃষ্টিশীলতার অন্যতম প্রেরণা। আবার বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্ট সামাজিক সংকট থেকেই যে বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তার ফলে অভিজ্ঞতা-নির্ভর কর্মবাদেও তাঁর প্রবল আস্থা ছিল। এই বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'আমরা ও তাঁহারা' (১৯৩১)-তে। যেখানে বুদ্ধিজীবী ও অভিজ্ঞতাজীবীর দুই ভিন্ন জগৎ ধরা পড়েছে। এভাবেই যুক্তিনির্ভরতা, সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধের জগত। তাঁর 'চিন্তয়সি' (১৯৩৩), 'বক্তব্য' (১৯৫৭) প্রবন্ধ গ্রন্থে তাঁর স্বকীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এসব গ্রন্থে তিনি সবুজপত্র-কে কেন্দ্র করে একদা যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যধারা তৈরি হয়েছিল তারই ধারা বহন করেছেন। প্রমথনাথের প্রসাদ গুণ সম্পন্ন চিন্তা বিন্যাসের রীতি যেমন খুঁজে পাওয়া যায় ধূর্জটিপ্রসাদের গদ্যরীতিতে তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্য কৃতির ঐতিহ্য ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিদ্যাচর্চার বিশিষ্ট ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাবও পড়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে।

বলতে চাওয়া নানা কথাকে নিয়ে গ্রন্থিত 'বক্তব্য'-র বিন্যাসকে প্রাবন্ধিক বিভাজন করেছেন সমাজচিন্তা, সংস্কৃতি সংক্রান্ত চিন্তা অংশে। এই গ্রন্থে প্রাবন্ধিক ব্যাখ্যা করেছেন সদ্য স্বাধীন হয়ে ওঠা ভারতবর্ষের সর্বগ্রে প্রয়োজন 'নব্যসমাজ দর্শন'। তাঁর সমাজ দর্শন ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে সমাজের অভিজ্ঞতা সাপেক্ষতা এবং পরীক্ষা-নির্ভরতার শক্তি। তাঁর মনে হয়েছে, 'মানুষ হবে পুরুষ; সে একক ব্যক্তিসত্তা বা ইন্ডিভিজুয়াল হবে না, — হবে 'পার্সন'।' তাঁর প্রবন্ধের গূঢ় বৈশিষ্ট্য— সমাজের সঙ্গে সংযোগ বোধের আকাঙ্ক্ষা, তাঁর অনুসন্ধানী মেধা ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্বগত ধারার আদর্শে। তবে তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসা কিন্তু গ্রন্থসর্বস্ব জ্ঞানচর্চা মাত্র নয়—তাঁর জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার সত্য নিহিত রয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী সত্যোপলব্ধিতে।

প্রবন্ধ ছাড়াও ধূর্জটিপ্রসাদ গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন। উপন্যাসে প্রবন্ধোচিত মননশীলতার পরিচয়ই বেশি। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রিয়লিস্ট' (১৯৩৩) যেখানে পাঁচটি গল্প আছে। স্টাইলের দিক থেকে প্রমথনাথ চৌধুরীর অনুসরণ স্পষ্ট। তাঁর সবথেকে বিশিষ্ট রচনা উপন্যাস-ত্রয়ী— 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১৯৪৩)— যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক বেষ্টনীতে দুই নরনারীর আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রেম-উপলব্ধির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত ছিল।

একটি বিষয় স্পষ্ট, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মনন ও চিন্তনে অভিজ্ঞতাজনিত সত্যকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন, আর রচনারীতির দিক থেকে তিনি প্রমথনাথ চৌধুরীকে আদর্শ করেই সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যসম্ভার।

১.৮ সংক্ষিপ্ত টীকা

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা/কালীপ্রসন্ন সিংহ ঃ

এই গ্রন্থটি কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে 'হুতোম প্যাঁচা' রচনা করেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। পরে সম্পূর্ণ খণ্ড প্রকাশ পায় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। এতে উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের ও সমাজের এক সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত দেওয়ান বংশে। তাঁর পিতার নাম নন্দদুলাল সিংহ। তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে প্রথম পর্যায়ের বিদ্যাশিক্ষার পর রবীন্দ্রনাথের মতো বাড়িতেই বাকি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকাল অতিসামান্য, —মাত্র ত্রিশ বৎসর। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলা সাহিত্য ও সমাজের জন্য যা করে গেছেন, সে জন্যই তাঁকে আজও প্রতিটি বাঙালি স্মরণ করেন। সমাজ সংশোধন, স্বদেশ হিতৈষণা, উদার দানকার্য ইত্যাদি নানা দিকে তিনি নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৫৩ সালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা, এই সভার পক্ষ থেকে কবি মধুসূদনকে বঙ্গভারতীর সেবার জন্য সংবর্ধনা এবং কালীপ্রসন্নের শিক্ষক ডি. রিচার্ডসনকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন ছাড়াও, তাঁকে বিলাত যাবার পাথেয় প্রদানের পেছনে রয়েছে এই ব্যক্তির হাত। তাঁর এই সভার পক্ষ থেকে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এই মঞ্চের জন্য তিনি নাটকও রচনা করেন। 'বাবুনাটক' (১৮৫৪); 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৭); 'সাবিত্রী-সত্যবান নাটক' (১৮৫৮) ইত্যাদি তাঁর রচিত নাটক। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল, সংস্কৃত মহাভারত বাংলা গদ্যভাষায় অনুবাদ করা। তাঁর সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় দুটি পত্রিকার মধ্য দিয়ে— 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) এবং 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (১৮৫৬) নামক মাসিক পত্রিকা। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সমর্থন, বহুবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি দেশহিতৈষণামূলক কাজ করে গেছেন। এছাড়াও তাঁর বহুবিধ বদান্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— 'নীলদর্পণে'র মামলায় রেভারেন্ড লঙ-এর জরিমানার হাজার টাকা দেওয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষে দান, গ্রাণ্ট মেমোরিয়াল ফান্ডে দান, কলকাতায় নিজের খরচে প্রথম পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তাঁর বদান্যতারই পরিচয় বহন করে।

এসব সামাজিক কাজের কথা বাদ দিলে তিনি যে কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন তা তাঁর অমর সৃষ্টি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'। তিনি সমাজের নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও সেদিনের বাঙালির জীবন-চর্চার খুঁটিনাটি দিকগুলো তাঁর নজর এড়াতে পারেনি। তাঁর 'নক্‌শা'র সূচিপত্র দেখলেই এই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়। যেমন— 'কলিকাতার চড়কপার্বণ'; 'হুজুক'; 'ছেলেধরা'; 'ক্রিশ্চানি হুজুক'; 'সাতপেয়ে গরু'; 'ছুঁচোর ছেলে বুঁচো', 'পাদ্‌রি লঙ্ ও নীলদর্পণ'; 'বুজরুকি' ইত্যাদি।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে উপন্যাস বলা যায় না। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— "আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম— এখন আপনাদের স্বেচ্ছামতো তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।" উল্লেখ্য তিনি একে 'নক্‌শা' বলেছেন, উপন্যাস নয়। এই নকশা রচনার অভিপ্রায় সম্পর্কে হুতোম বলেন— "কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচারিত হল, নক্‌শাখানির দুপাত দেখলেই সহৃদয়

মাত্রেই তা অনুভব কর্ত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্‌শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই— " তাঁর রচনাতে সত্যিই বাস্তবও জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায়, যা এই রচনাকে সজীব ও সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করেছে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, এর ভাষার প্রসঙ্গটিও অবশ্য-বিচার্য। কালীপ্রসন্নের হুতোমি ভাষা অবিমিশ্র চলিত বাংলা। কালীপ্রসন্নের অভিনব গদ্যরীতি পরবর্তী বাংলা গদ্যের জন্য মহামূল্য ঐতিহ্য রেখে গেছে। তিনি আসলে চলতি রীতিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করেছিলেন। আবার প্রবাদ-প্রবচনের সাবলীল ব্যবহারও তাঁর গদ্যে দুর্লভ নয়। তাঁর গদ্যের একটু উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

"কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা-বিবাহের দিন বালী, উত্তোর পাড়া, অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্‌চায্যিরা সভাস্থ হন — ফলার বিদেয় মারেন, তারপর ক্রমে গা ঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সেদিন শয্যাগত ছিলাম।"

কলিকাতা কমলালয় / ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ঃ

উনিশ শতকের পটভূমিকায় কয়েকজন প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বাঙালির আবির্ভাব হয়েছিল যারা নবযুগের নান্দীপাঠ করেছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এঁদেরই অন্যতম। তিনি বহু দিক দিয়ে আধুনিক ও জনহিতব্রতী ছিলেন। সাংবাদিক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর খ্যাতির পাশাপাশি, তিনি তার্কিক হিসাবে বিপক্ষদলের ভীতির কারণ ছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে তিনি যুক্তভাবে সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারিদের নিন্দাবাদের জবাব দেওয়ার জন্য রামমোহন ও ভবানীচরণ মিলে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করেন। কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে ভবানীর মতভেদের ফলে তিনি পত্রিকা ত্যাগ করেন এবং ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ক্রমে ক্রমে এটি রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল।

ভবানীচরণ ব্যঙ্গাত্মক নকশা-জাতীয় গ্রন্থ রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি চারখানি নক্‌শা জাতীয় গ্রন্থ লিখেছিলেন— 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩); 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫); 'দূতীবিলাস' (১৮২৫); 'নববিবি বিলাস' (১৮৩০)। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চারখানি নক্‌শাতেই সমকালীন কলকাতার নাগর-নাগরী সমাজকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। সব স্যাটায়ারধর্মী ব্যঙ্গ লেখকদের মতো ভবানীচরণের উদ্দেশ্যও ছিল মহৎ। দুর্নীতি ও কালিমালিপ্ত তৎকালীন কলকাতার সমাজকে বা পরিবারকে পরিশুদ্ধ করার জন্যই এই নক্‌শার জন্ম।

কোনো এক গ্রামবাসী কলকাতায় এলে নগরবাসীর দ্বারা বঞ্চিত বা উপহসিত হয়। তাকে কীভাবে শহরে চলতে হবে— সেই পরামর্শ দেবার অভিপ্রায়েই কলিকাতা কমলালয় রচিত হয়। এই শহরের ত্রুটি কোথায়, কেন গ্রামবাসী ও শহরবাসীর মধ্যে অহি নকুল সম্পর্ক— এ সব কথা আলোচনার জন্য লেখক ভবানীচরণ কল্পিত গ্রামবাসী ও নগরবাসী তৈরি করেছেন। বস্তুত, 'কলিকাতা কমলালয়' প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা কলকাতার রীতিবর্ণনা।

এই গ্রন্থে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্রতা খুব কম। শুধু অজ্ঞ গ্রামবাসী প্রচ্ছন্নভাবে কলকাতার দোষকীর্তন করতে গিয়ে কিছু কিছু রসিকতা করেছে— যার মধ্যে চাপা ব্যঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুত, ভবানীচরণ গ্রন্থটিতে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তাঁর সমকালীন কলকাতার নগরজীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে রঙ্গব্যঙ্গের সাহায্য নিয়েছেন। 'কলিকাতা কমলালয়ে'র ভাষাবিন্যাস অধিকতর সরল ও অনায়াস-বোধগম্য। কলকাতা-জীবনের লীলা দেখাতে গিয়ে ভবানীচরণ অর্ধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেছেন। এই গ্রন্থে ধনীলোকের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রগণই কাপ্তেন বা বাবু নামে খ্যাত ছিল।

সংবাদ প্রভাকর ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা এই 'সংবাদ প্রভাকরে'। ঈশ্বর গুপ্ত যখন মাত্র উনিশ বছরের যুবক তখন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৩১ সালের মাঘ মাসে সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে এই সাময়িক পত্রটি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রথম কিছুদিন নড়বড়ে ভাবে এগিয়ে গিয়ে এই পত্রিকা বারত্রয়িক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। শেষে আট বৎসর পর ১৮৩৯ খিস্টাব্দের ১৫ জুন দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য তৎকালের বঙ্গদেশের সমস্ত বিশিষ্ট এই পত্রিকার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরা তাঁর ছোটো ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর প্রতি সংখ্যায় একটি সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত থাকত, সেটি হল— 'সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ। উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনপ্রভাকর।।"

এই পত্রিকার জন্মের প্রায় দেড় বছর পর এর পৃষ্ঠপোষক যোগেন্দ্রমোহনের আকস্মিক মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছু আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ার গুপ্ত কবি প্রভাকরের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। আবার ১৮৩৩-এ তিনি দায়িত্বভার পুনরায় গ্রহণ করে পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। তখন এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক বদল হয়ে হলেন ওই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারেরই কানাইলাল ও গোপালচন্দ্র নামে দুই ভাই।

এই পত্রিকাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা বলা যায়। কারণ এর আগে যে কটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রধানত ধর্ম-তর্ক ইত্যাদিতেই পরিপূর্ণ থাকত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকায় সংবাদ-সাহিত্য ছাড়াও সমকালীন ঘটনা অবলম্বন করে সরস পদ্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করেন এবং তা জনপ্রিয়ও হতে থাকে। এছাড়াও এই পত্রিকাকে আশ্রয় করেই ভবিষ্যতের শক্তিমান এবং সৃষ্টিশীল অমিত প্রতিভাধর কিছু লেখক ও কবিগোষ্ঠীর সাহিত্য রচনার পরিবেশও সৃষ্টি হতে থাকে। এঁদের মধ্যে রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা যায় এঁদের অবলম্বন করে 'প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় একটি Literary School গড়ে ওঠে, যা সেদিনের পটভূমিকায় ছিল অভাবনীয়।

এছাড়াও 'প্রভাকর'-এর আরেকটি ভাবনাতীত কাজ হল বাংলার পুরাতন কবিদের

জীবনকীর্তি সংগ্রহ ও প্রকাশ। এ ব্যাপারে কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত তথ্যানুসন্ধানকারী, গবেষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর পরিশ্রম ও অনুসন্ধানস্পৃহা প্রশংসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। যাঁদের জীবন ও কাব্যপ্রতিভা 'প্রভাকরে'র পাতায় আলোচিত হয়েছে, তাঁরা হলেন— (ক) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (খ) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ (গ) রামনিধি গুপ্ত (ঘ) রাম বসু প্রমুখ। তাছাড়াও ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকার পাতায় তাঁর 'প্রবোধ-প্রভাকর'; 'হিত-প্রভাকর'; 'বোধেন্দু-বিকাশ'; 'শ্রীমদ্ভাগবতে'-র গদ্যানুবাদ (অসমাপ্ত) প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার যে ঘটনাটি উল্লেখ না করলে নয়, সেটি হচ্ছে 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ'। উল্লেখ্য দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী যথাক্রমে হিন্দু, হুগলি ও কৃষ্ণনগর কলেজের তিন কৃতী ছাত্র 'প্রভাকরে'র পাতায় কবিতার মাধ্যমে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিলেন সেটিই 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' নামে পরিচিত।

তত্ত্ববোধিনী সভা পত্রিকা ঃ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যগণ বাংলা সাময়িক পত্রের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে এ পরিবারের যুবকগণ। রামমোহনের পর তাঁর প্রবর্তিত মতাদর্শকে বহন করার দায়িত্ব এসে পড়ে ঠাকুর পরিবারের বড়ো পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। এই দেবেন্দ্রনাথই 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামে এক সভা স্থাপন করেন, এবং কিছুদিন পরে এর নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। এর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্যকে যুক্ত করে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন— যার নাম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। এই পত্রিকাটি প্রথমে ছিল মাসিক। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা, ব্রহ্ম-উপাসনার পদ্ধতি প্রচার করা এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের দূর, প্রবাসী সদস্যগণের কাছে জ্ঞানোন্নতি সাধন তথা তথ্যানুসন্ধানের তত্ত্ব পৌঁছানো— সেজন্যই দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকাটি উদ্বোধন করেন। প্রথমে এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত। কিছুদিনের মধ্যেই অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর আপন মনীষা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দ্বারা এই পত্রিকাকে উনিশ শতকের মধ্যভাগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা দেন। উল্লেখ্য বঙ্কিমের গদ্য রচনার দক্ষতা প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠাতেই অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় আপন মহিমার ছাপ রেখে গেছেন। এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় অক্ষয়কুমার দত্ত নিয়মিতভাবে দর্শন-বিজ্ঞান, সমাজ-সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন।

এই পত্রিকার সমাজ সচেতনতার বড়ো পরিচয় হল, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও অপরাপর সামাজিক বা রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতিবাদ। খ্রিস্টধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগকে এই পত্রিকাই সংযত করেছিল। এইভাবে নানা দিক থেকে এই পত্রিকা তৎকালীন বাঙালির মনোভাবকে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এই পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু প্রবন্ধ বা আলোচনা, রচনা-সমৃদ্ধি বা ভাষাসৌকর্যের জন্য কলেজ বা বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ঃ

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুইখণ্ডে বিভক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত একটি সুপরিচিত নিবন্ধ গ্রন্থ। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এবং ২য়টি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এর উৎস হচ্ছে হোরেস হেমান উইলসনের Religious Sects of the Hindus। অক্ষয়কুমারই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি হিন্দুদের নানা উপসম্প্রদায়, ভদ্রেতর শ্রেণি ও রহস্যবাদীদলের পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-কর্ম, সাধন-প্রণালী তিনি বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে সন্ধান করেছেন। কীভাবে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম ও উপসম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সে বিষয়ে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই তিনি আলোকপাত করেছেন। উইলসন যে সমস্ত উপধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি, অক্ষয়কুমারের পরিশ্রম ও গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছিল। কাশীরাজের মুনশি শীতলসিংহ এবং স্থানীয় কলেজের গ্রন্থাগারিক মথুরানাথের ফারসি ভাষায় রচিত দুটি গ্রন্থ অক্ষয়কুমারের তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়ক হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের হাতে উইলসনের সংগৃহীত তথ্যের কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংযোজন সাধিত হয়েছে। অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থের প্রথমভাগে রামসনেহী, বিষ্ণুভক্ত, কর্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী, প্রভৃতি ২২টি সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে।

প্রভাবতী সম্ভাষণ ঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রায় বেশিরভাগ রচনাই অনুবাদমূলক। কিন্তু 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (আঃ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর মৌলিক আত্মনিষ্ঠ রচনা। এটি আকারে ছোটো হলেও অন্তর্গূঢ় রচনা। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় এটি প্রথম মুদ্রিত করেন। এই প্রবন্ধ রচনার ইতিহাস সম্পর্কে সমাজপতি মহাশয় বলেন— "পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত, মাতামহদেবের বিশেষ সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রভাবতী এই রচনার বিষয়। ১৮৭২ শকের ২৩ শে মাঘ প্রভাবতীর জন্ম হয়; ১৮৭৫ শকের ৪ ঠা ফাল্গুন, তিন বৎসর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। মাতামহদেব, প্রভাতীকে অপত্য নির্বিশেষে ভালবাসিতেন। এই সময়ে, নানাবিধ কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। ....প্রভাবতীর স্মৃতিচিত্র জাগরূপ রাখিবার জন্য, তিনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।"

সংসারের সব দিক থেকে আঘাত পেয়ে তিনি যখন ভারাক্রান্ত তখন ওই শিশুটি তাঁর বৃদ্ধ-প্রাণে আরাম দিত। সেই শিশুর মৃত্যু তাঁকে বিবশ করে ফেলায় তিনি লেখনীর মাধ্যমে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করেন। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-ই বাংলা সাহিত্যে প্রথম শোকগাথা হিসাবে গৃহীত হবার যোগ্য। 'প্রভাবতী সম্ভাষণে' সাহিত্যিক মূল্য যদি কিছু থাকে, সেটি হচ্ছে ওই নিভৃত চিত্তের স্নেহার্তি। অনন্যমনা, অবিচলিত স্নেহে আকুল হৃদয় ধর্মই বিদ্যাসাগরের অনুবাদ ও মৌলিক সাহিত্যকর্মকে প্রাণ-সঞ্জীবিত করে তুলত। এখানেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার উৎসমুখে অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যথার্থ শৈল্পিক মর্যাদা ধরা পড়ে। এই রচনা থেকে বিদ্যাসাগরের মতো

প্রখর পণ্ডিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অন্তস্থলের স্নেহকাতরতা তা অনুমান করা যায়। তাঁর হৃদয়বত্তার রূপ এবং সরস গদ্যের স্বরূপকে 'প্রভাবতী সম্ভাষণে'-র কিছু পংক্তির সাহায্যে ধরা যেতে পারে। যেমন— "কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তি মাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও প্রভূত মাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিগোচর করিয়া নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র/বিবিধার্থ সংগ্রহ ঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত ব্যক্তি আপন প্রতিভা বা মনীষার দ্বারা তৎকালীন বঙ্গীয় জীবনে নতুন চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, পুরাতত্ত্ববিদ। তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে শ্রদ্ধা তাঁকে দেশে নয়, বিদেশের পণ্ডিত মহলেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জীবনে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর ব্যাপারে তাঁর অবদান উল্লেখের দাবি রাখে। এ সম্পর্কে সমালোচক বলেন— "তাঁহার গভীর অধ্যয়ন ও অক্লান্ত গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির বহু অজানা অন্ধকার-কক্ষ অভিনব আলোক-সম্পাতে প্রোজ্জ্বল হইয়া ওঠে;" কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কৃতিত্বের জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেননি। মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম অনুরাগের জন্যও তিনি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। মাতৃভাষার কল্যাণ, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি সব সময়ই চিন্তা করতেন এবং কর্মব্যস্ত জীবনেও সাধ্যমতো এই কাজে নিজেকে সমর্পণ করতেন। তিনি একদিকে পত্রিকা সম্পাদক ও বাংলা পুস্তক সমালোচনায় নবধারার প্রবর্তক, অন্যদিকে ভৌগোলিক পরিভাষা গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন সাহিত্য-প্রচেষ্টার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

কলিকাতার শুঁড়া অঞ্চলে এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় ১৮২২ সালে। তাঁর ছাত্রজীবন গৌরবময়। তিনি প্রথম মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং পরে তা ছেড়ে দিয়ে আইন নিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি ইংরেজি-বাংলা ছাড়াও ফারসি, সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দু ভাষা জানতেন। তাঁর সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির নাম বিশেষভাবে জড়িত। তিনি দেশের সামাজিক, সারস্বত, রাজনৈতিক, ও বহুবিধ জনহিতকর উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সবসময় জড়িয়ে থাকতেন। তাঁর চরিত্রগুণ ও মহৎ প্রতিভাগুণে তিনি সেকালের বিদ্বৎ-মণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর গুণে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথও একদা বলেন, "তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।"

রাজেন্দ্রলালের মধ্যে ছিল বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর প্রতিভা যে কত বিষয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার একটি ছোটো নমুনা তাঁর এই গ্রন্থগুলি— 'প্রাকৃত ভূগোল'; 'শৈল্পিক দর্শন'; 'শিবাজীর চরিত্র'; উল্লেখ্য, ইংরেজি ও সংস্কৃতেও তাঁর রচিত ও সম্পাদিত কিছু গ্রন্থ আছে।

এসব ছাড়াও তাঁর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব পত্রিকা সম্পাদকরূপে। তিনি প্রথমে কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এরপর তিনি নিজের উদ্যোগে ১৮৫১

খ্রিস্টাব্দে বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের অনুসরণে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, প্রাণিবিদ্যা, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক এই পত্রিকা সেকালে নানা জ্ঞান-প্রচার ও শিল্পগত উৎকর্ষ নিয়ে সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যা কিছু রাজেন্দ্রলালের আলোচনার বিষয় ছিল তা তিনি প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করতে পারতেন। এই দুর্লভ গুণের ছত্রছায়ায় কালাতিপাত করেও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। এর পর তিনি প্রকাশ করেন 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩); এই পত্রিকাটিও ছিল মাসিক পত্রিকা। আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, পত্রিকার পৃষ্ঠায় সমকালীন সাহিত্য গ্রন্থের সমালোচনার রীতির প্রথম প্রবর্তক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর হাত ধরেই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর পাতায় এই রীতির প্রথম প্রচলন। এই মহান ব্যক্তিত্বের দেহাবসান ঘটে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে।

ভারতী ঃ

'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাম চিরকালই জড়িত থাকবে, জড়িত থাকবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও। তিনি ছিলেন ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিস্বরূপ; নানা আন্দোলন ও নতুন নতুন বিষয়কর্মের উদ্ভাবক। তিনিই একদিন প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ি থেকে একটা মাসিকপত্র প্রকাশ করার। সেই ইচ্ছা থেকে তৈরি হল 'ভারতী'। অবশ্য তিনি কখনও সম্পাদকের তালিকভুক্ত হননি। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ষোলো বৎসর তখন অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'ভারতী'-র প্রথম সংখ্যা বের করা হয়। তখন এই পত্রিকার সম্পাদন ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়— "ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা নামেই প্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, আলোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব।"

'ভারতী' পত্রিকাটি অনেকদিন স্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে যাঁরা এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তাঁদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে—

(ক) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৮৪-১২৯০ সাল)
(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯১-১৩০১ সাল)
(গ) হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী (১৩০২-১৩০৪ সাল)
(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৫ সাল)
(ঙ) সরলা দেবী (১৩০৬-১৩১৪ সাল)
(চ) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৩১৫-১৩২১ সাল)
(ছ) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৩২২-১৩৩০ সাল)
(জ) সরলা দেবী (১৩৩১-১৩৩৩ সাল)

উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ইচ্ছায় ১২৯২-এর বৈশাখ মাসে 'বালক' নামে একটি মাসিক সচিত্র কাগজ বের করা হয় বালকদের জন্য। এর পরোক্ষ সম্পাদনার ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। এক বৎসর সগৌরবে প্রকাশিত হবার পর 'ভারতী-র সঙ্গে এটি মিশে যায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে, এই নতুন সংযুক্ত পত্রিকার নাম হয় 'ভারতী ও বালক'।

'ভারতী' প্রকাশের অন্যান্য বহু সার্থকতা থাকলেও, রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী আত্মপ্রকাশ ঘটে এই পত্রিকার মধ্য দিয়েই। এতে তিনি কবি, গল্পকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা ছাড়াও সমালোচক হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র সমালোচনায় ৩৬ পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ রচনা করেন ১২৮৪ সালে। ভানুসিংহ ছদ্মনাম দিয়ে পদাবলি সাহিত্যেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই এগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ সালে মাত্র এক বৎসরের জন্য 'ভারতী'-র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করে বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। 'ভারতী' শেষ আট-নয় বৎসরে প্রথমে ২০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ও ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিটে এক সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে তুলেছিল, সেখানে যোগদান করতেন সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্য-রথীগণ। পরিশেষে 'ভারতী' সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকারের একটি মন্তব্য স্মরণ করে আমরা আমাদের আলোচনা সাঙ্গ করব— "প্রথম প্রকাশের দিন হইতেই ভারতী পত্রিকা নূতন ও তরুণ গদ্য-লেখকদের প্রতি আনুকূল্য করিয়া আসিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দের বহু শ্রেষ্ঠ ও কৃতী লেখক ভারতীর আসর ভর করিয়াই সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। ভারতীয় আসরের উপান্ত্য পালার মূল অধিকারী ইনিই ছিলেন। বর্তমান শতাব্দের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ভারতীকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যগোষ্ঠী জমিয়াছিল তাহার চৈত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং দীক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ।"

সবুজপত্র ঃ

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে 'সবুজপত্র' পত্রিকা ও তার নায়ক-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী দুটি অবিস্মরণীয় নাম। প্রমথ চৌধুরীর সুযোগ্য সম্পাদনায় (১৮৬৮-১৯৪৬) 'সবুজপত্র' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' প্রাপ্তির প্রায় এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিত্যে গণচেতনা ও জন-অধিকার, রচনার ক্ষুদ্রত্ব, সাহিত্য সেবা বেনিয়াবৃত্তির উপায় এবং কৃত্রিমতা ও ভাবাবেগের তারল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকার প্রকাশ। পত্রিকাটির শিরোদেশে লেখা থাকত 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'— প্রাণের, যৌবনের, গতির জয়ঘোষণা করেই এই সাময়িক পত্রের আত্মপ্রকাশ। সবুজপত্রের সবচেয়ে বড়ো অবদান, কথার ভাষাকে সাহিত্যিক কৌলীন্য দানের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দান। সাধুভাষা কেবল বলিষ্ঠ ভাবকল্পনার বাহন হতে পারে, এই মন্তব্য খণ্ডন করে চলতি ভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী যথার্থ সাহিত্য-ভাষারূপে প্রথম চৌধুরী ও তাঁর অনুগামীরা এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের অভিজাত মনের সুকর্ষিত রচনাগুলি সবুজপত্রের পৃষ্ঠায়ই প্রকাশ পায়। সংস্কার বর্জিত আধুনিক মনোভাবের সার্থক প্রকাশ সেদিন 'সবুজপত্র' পত্রিকায় লক্ষ

করা গিয়েছিল। নবীন সাহিত্যিকের পরিশীলিত যুক্তিকে সেকালের লেখক সমাজ যে গ্রহণ করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে ভাব ও ভাষার বর্তমান রূপই সে কথা প্রমাণ করে। ভাবের জড়তামুক্তি ও ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিদান 'সবুজপত্র' পত্রিকার অক্ষয় কীর্তি। চলতি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস ইত্যাদি সবুজপত্রের পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশ-গৌরব লাভ করেছিল। বাংলাসাহিত্যের সংস্কার মুক্তির ক্ষেত্রে 'সবুজপত্রে'-র পুরোযায়ী ভূমিকার প্রশংসা রবীন্দ্রনাথও বিভিন্নত্র করেছেন।

'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কেননা, উচ্ছ্বাসহীন, ভাবসংহত ও পরিমিত ভাষা ব্যবহার করে মূল সত্যটিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল মাত্র কয়েকজনের। তাই প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কবিকন্যা, মাধুরীলতা দেবী প্রমুখ ব্যক্তিরাই এর সঙ্গে প্রথম অবস্থায় জড়িত ছিলেন। সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায়ই রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, —যে কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্র-কাব্যে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

বস্তুত প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল নামের বিখ্যাত সম্পাদকের হাত ধরে যে 'সবুজপত্র' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ, —বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা আজও প্রাসঙ্গিক।

কল্লোল গোষ্ঠী ঃ

বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত বহতা ধারায় একটা বড়ো আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা গেল। বহমান গতিকে ভিন্নমুখী করার উদ্যমে অর্থাৎ মূলত রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টায় কিছু তরুণ সাহিত্যিক সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে উত্তরণের স্বরূপ তাঁদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। এই দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা বিশ শতকের তরুণ মানসের যন্ত্রণার অন্যতম উৎস। এরই ফলস্বরূপ ১৩৩০ সালের ১লা বৈশাখ 'কল্লোল' প্রকাশিত হল। 'কল্লোল' একটি মাসিক পত্রিকার নাম। এই মাসিক পত্রিকার প্রভাব এত বিস্তৃত ছিল যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ সময়কে 'কল্লোল যুগ' বলে নির্দেশ করা হয়। এই যুগে যে সকল লেখক কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ প্রবর্তনের সংকল্প করেছিলেন তাঁরাই 'কল্লোল গোষ্ঠী' বলে পরিচিত। কল্লোলের প্রধান লক্ষণ ছিল রবীন্দ্র-বিদ্রোহ।

দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখ কয়েকজন দুঃসাহসী সাহিত্যপ্রেমী যুবকের চেষ্টায় 'কল্লোল' প্রকাশ পায়। বলা যায়, এই পত্রিকাকে আশ্রয় করেই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয়। এই পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এই পত্রিকা মাত্র সাত বৎসর টিকে ছিল, অর্থাৎ ১৩৩০ থেকে ১৩৩৬ পৌষ পর্যন্ত এর আয়ু। এই পত্রিকাটিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-বিপরীত ধারাটিকে পরিচালনা করে। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৩-২৪-এর দিকে বাঙালি শিক্ষিত যুবকদের সামনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব পড়ে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে। বেশ কিছু তরুণ প্রতিভা 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ঐতিহাসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন— যাঁদের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা।

প্রত্যেক পত্রিকারই এক একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য থাকে, কল্লোলেরও ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দীনেশরঞ্জন দাসের 'কল্লোল' কবিতাটিতে এই পত্রিকার মূল লক্ষ্যটির আভাস, পাওয়া যায়— "আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন/অজানা নয়নের বারি নীল/চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি/পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।"

'কল্লোল' আরম্ভ হয় মাসিক গল্প-সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে এবং ঘোষণা করা হয় এরকম গল্প-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম কিন্তু সে ব্যাপারটি পরে রক্ষিত হয়নি পত্রিকার পাতায়। কর্তৃপক্ষের উক্ত ঘোষণা সত্ত্বেও কল্লোলের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে অসংখ্য কবিতা। সেকালের, একালের প্রখ্যাত অনেক লেখকই কল্লোলের পাতায় লিখেছেন। কল্লোলের ঐতিহাসিক, পালাবদলের প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, "তার সাধনায় যেটুকু অভিনব ও নতুনকালের সম্পদ, আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্যই বেশি। কল্লোলের কালে বাংলা সাহিত্য পালাবদলের মহড়া দিয়েছে। মহড়ার পরের কাহিনী হচ্ছে আসল কথা, সেখানেই সত্যাসত্য যাচাই হয়। তাই কল্লোলের ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজতে হবে শুধু তার সাত বছরের জীবৎকালের মধ্যে নয়, কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও।"

পরিচয় পত্রিকা ঃ

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে এই পত্রিকার যাত্রা শুরু হয় ত্রৈমাসিক হিসাবে এবং আজও মাসিক পত্র হিসাবে পত্রিকা নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবা করে চলেছে। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)। ইনি ছিলেন তৎকালের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এবং বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের বড়ো ভাই শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে সাংবাদিকতার সূত্র প্রথমে যুক্ত হন। অবশ্য এর আগে তিনি জড়িত ছিলেন নবপর্যায়ের 'সবুজপত্রে'র সঙ্গেও। এভাবে সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে কাজ করতে করতে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে। তখন বন্ধু-পরিজনদের সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু রুচি ও আদর্শ অনুসারে পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ ছিল না। বাংলাদেশে সে সময়কার অভিজাত পত্রিকা হল 'প্রবাসী'। তাঁর রুচিবোধ ছিল উচ্চস্তরের। তাই তাঁর ইচ্ছা, পত্রিকা এমন হতে হবে যা বাংলা সাহিত্যের সুধী ও বিদ্বৎসমাজের কাছে বরণীয় হয়। এভাবেই অবশেষে 'পরিচয়' পত্রিকার জন্ম হল।

এই পত্রিকার মান কেমন ছিল তার একটি ছোটো উদাহরণ দেওয়া যায়। এই পত্রিকা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের ভাই হরীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এর বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, তিনি লিখেছেন— "....রবীন্দ্রনাথকে জানানো হল। প্রথম সংখ্যায় তিনি কিছু লিখলেন না, কিন্তু পত্রিকা দেখে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই চিঠি পাঠালেন— নামে চিঠি বস্তুত প্রবন্ধের আকৃতি।" এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যা থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন এর যোগ্যতা, তাই পরবর্তী সংখ্যায় তাঁর এই দীর্ঘ চিঠি। উল্লেখ্য

যে, প্রথম সংখ্যায় যে সব লেখক ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক— হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরবল, ধূর্জটিপ্রসাদ, হেমেন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। প্রথম দিকে এই পত্রিকায় কোনো প্রচ্ছদ ব্যবহার করা হত না, তবে পরবর্তী কালে যামিনী রায় এই পত্রিকার জন্য অনেক প্রচ্ছদ এঁকেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল পুস্তক পরিচয়। নানা গুণে এবং উচ্চ শ্রেণির সাহিত্য সরবরাহের জন্য এই পত্রিকা সে যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট পত্র 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী', 'বিচিত্র' প্রভৃতির ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই পত্রিকার প্রায় সমস্ত কৃতিত্বই সুধীন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

বাংলা সাহিত্যের চিন্তার জগতে, মনন ও মুক্ত উদার বুদ্ধিবাদের নিরিখে এই পত্রিকার অবদান অবিস্মরণীয়। এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একে ষষ্ঠ বর্ষ থেকে মাসিক পত্রিকায় পরিণত করেন। আধুনিক প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের মুখপত্র হিসাবে 'পরিচয়' সবসময় পরিচিত। বিশ শতকের তিন-চার ও পাঁচের দশকের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট প্রবন্ধকার-কথাকার ও কবি এই পত্রিকার মানোন্নতি করেছেন। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মোট বারো বৎসর 'পরিচয়-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ১৯৪৩-এর জুলাই মাসে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর নীরেন রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রসঙ্গত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য কথা উদ্ধার করে আলোচনা সমাপ্ত করা যায়— "এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ— ভাষা সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগ-যুগ সঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। ...বাঙলাদেশে 'পরিচয়' আজ এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালি পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী ....এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে।"

১.৯ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের সামগ্রিক আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, নবজাগরণের ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণসঞ্চার হল। নবযুগের সাহিত্যের মূলগত প্রেরণা ও আশ্রয় হল মানুষ— মানুষের জীবন। আধুনিক যুগে গদ্যরীতির উদ্ভব ঘটল। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, রসসাহিত্য— গদ্যসাহিত্যের বিচিত্র রূপরীতি প্রকাশিত হল। বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদান অনস্বীকার্য। কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে বাংলা গদ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ লেখক। এরপর রামমোহন রায় যৌক্তিক পারম্পর্যে সুগঠিত করে আধুনিক মনের উপযোগী করে তুলেন। তবে বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এলোমেলো বাংলা গদ্যরীতিকে এক সুবিন্যস্ত শৃংখলা প্রদান তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনে সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাময়িক পত্র ছাত্রবোধ্যতার হাত থেকে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে উদ্ধার করে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করল। প্রথম পর্বের সাময়িক পত্রগুলিতে সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনই বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। বঙ্কিমের আবির্ভাবে প্রবন্ধ সাহিত্যে চিন্তাপ্রধান ও রসপ্রধান উভয় শাখারই প্রভূত উন্নতি ঘটে। সমালোচক বঙ্কিম সংস্কৃতানুগ ধারা পরিহার করে ইংরেজি সমালোচনা পদ্ধতি আশ্রয় করেছিলেন। অর্থনৈতিক প্রবন্ধে সাম্যবাদের পক্ষে তিনি মন প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা গদ্য চর্চায় চলিত রীতির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। এযুগের প্রাবন্ধিকদের রচনায় বিচিত্র বিষয় স্থান লাভ করেছে।

১.১০ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

বেন্থাম ঃ বিখ্যাত রাজনীতি-শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক। যে কাজ সবচেয়ে বেশি মানুষের সবচেয়ে বেশি মঙ্গল আনে, সেই কাজই শ্রেষ্ঠ— এই নীতির তিনি প্রচারক। তাঁর প্রচারিত নীতির নাম Utilitarianism বা উপযোগবাদ।

মিল ঃ এই প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিকের সম্পূর্ণ নাম জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি ফরাসি দার্শনিক কোঁতের মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বেন্থামের উপযোগবাদ তত্ত্বের উন্নতিসাধন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি বিখ্যাত।

রুশো ঃ বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও লেখক। প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করে তিনি অভিযুক্ত হন। তাঁর মতবাদ ফরাসি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। Confessions, Social Contract, ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

অমরকোষ ঃ অমরসিংহ প্রণীত সরল পদ্যে রচিত সংস্কৃত অভিধান। ভানুজি দীক্ষিত এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী, গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

বোপদেবের মুগ্ধবোধঃ বোপদেব গোস্বামী রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ। এতে সংস্কৃত শব্দ ও ধাতুরূপ, সংজ্ঞা, সূত্র, আদেশ, প্রত্যয় প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

১.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। প্রাচীনতর যুগের বাংলা গদ্যের ইতিহাস (প্রাক্‌মিশনারি পর্ব) লিপিবদ্ধ করুন।

২। 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যের সূচনা করেছিল এ কথা যথার্থ নয়।'— বিচার করুন।

৩। উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রসমূহের নাম করুন ও বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিকাশে এদের অবদান কী লিখুন।

৪। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা ও বিকাশ কীভাবে হয়েছিল তার বিবরণ দিন।

৫। উনবিংশ শতকের বাংলা রেনেসাঁস কি বুঝিয়ে লিখুন এবং বাংলা সাহিত্যে এই রেনেসাঁসের প্রভাব কেমন ছিল দেখান?

৬। 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (বাংলায়) যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তাহা সব শিক্ষামূলক, অথবা প্রচারমূলক কিংবা বিতণ্ডামূলক।' মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরূপণ করুন।

৭। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের দান ও স্থান তথ্যসহকারে আলোচনা করুন।

৮। বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ সৃষ্টি এবং বাংলায় গদ্য আখ্যায়িকা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব নির্দেশ করুন।

৯। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখুন।

১০। বাংলায় মননধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসু এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

১১। বাংলা নকশা রচনায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব এবং তাঁর রচিত নকশাগুলির সাহিত্যমূল্য নির্ণয় করুন।

১২। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সুবাদে বাংলায় যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল তার প্রকৃতি কেমন ছিল তা বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করে নির্ণয় করুন।

১৩। বাংলা গদ্যের বিকাশে উইলিয়াম কেরির অবদান কিরকম ছিল সে সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করুন।

১৪। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে উনবিংশ শতকের সাময়িক পত্রগুলির ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।' মন্তব্যটির অনুসরণে উনবিংশ শতকের সাময়িক পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন।

১৫। উনিশ শতকে বাঙালির সমাজ চেতনা ও সাহিত্য প্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছিল সাময়িক পত্রের পাতায়— এই সূত্র ধরে সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা ও বঙ্গদর্শন পত্রিকাগুলির মধ্যে যে কোনো দুটির ভূমিকা আলোচনা করুন।

১৬। উনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাস-বিজ্ঞানভিত্তিক অথবা ধর্ম-সমাজতত্ত্বমূলক আলোচনা কীভাবে গদ্যভাষার পুষ্টিসাধন করেছিল এই বিষয়ে রামমোহনের যুগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত ধারাবাহির পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

১৭। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত বাংলা গদ্য গ্রন্থগুলির কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যমূল্য ছিল না। আলোচনা করুন।

১৮। প্রাবন্ধিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বিচার করুন।

১৯। গদ্যশিল্পী হিসাবে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতখানি সবিশেষ আলোচনা করুন।

২৯। উনবিংশ শতকের প্রবন্ধ সাহিত্য অবলম্বনে একটি আলোচনা প্রস্তুত করুন।

২১। টেকচাঁদ ও হুতোমের সাহিত্যিক কৃতিত্বের তুলনামূলক বিচার করুন এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁদের দানের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ করুন।

২২। রবীন্দ্রনাথ বলেছেল, 'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্ স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জমান দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন।' যথোচিত তথ্যসহ এই উক্তির তাৎপর্য ও সার্থকতা নির্দেশ করুন।

২৩। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়গত এবং ভঙ্গিগত বৈচিত্র্য নির্দেশ করুন।

২৪। বিদ্যাসাগরের মৌলিকতা তাঁর রচনায়, বস্তু উপাদানে নিহিত নয়, মৌলিকতা তাঁর সুষম-সুললিত বাণীবিন্যাসে। আলোচনা করুন।

২৫। বাংলা প্রবন্ধের বিষয়গত ও ভঙ্গিগত রূপান্তর সাধনে প্রমথ চৌধুরীর অবদান সম্পর্কে লিখুন।

২৬। বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তনের কারণ নির্দেশ করে এর উদ্ভব এবং পরিণতির ধারাবাহিক বিবরণ দিন।

২৭। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা গদ্যের চলিত রীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৮। বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৯। **টীকা লিখুন ঃ**

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতা কমলালয়, সংবাদ প্রভাকর, সীতার বনবাস, দিগ্‌দর্শন, বেদান্ত চন্দ্রিকা, প্রভাবতী সম্ভাষণ, বিবিধার্থ সংগ্রহ, ভারতী, পরিচয়, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, সবুজপত্র, শকুন্তলা, হুতোম প্যাঁচার নকশা, কালিকলম, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা/সভা, কল্লোল পত্রিকা/গোষ্ঠী, সমাচার চন্দ্রিকা, কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১.১২ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ — ৪ দ্রষ্টব্য।

****

দ্বিতীয় বিভাগ
উপন্যাস— রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ও রবীন্দ্রনাথ

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)
২.১ উদ্দেশ্য (Objective)
২.২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২.৪ রবীন্দ্র পূর্ববর্তী অন্যান্য ঔপন্যাসিক
২.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা
২.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
২.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
২.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

পলাশির যুদ্ধের পর থেকে বাঙালি, মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনাশ্রিত জীবনচেতনার নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে আর এক নতুন জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ইংরেজের শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচির তরঙ্গ বাঙালির মনকে বিস্ময়ে ব্যাকুল করে তুলছিল; আর সেই বহিরাগত বিস্ময়ে বাঙালি তখন তার নিজস্ব পথানুসন্ধান করেছিল। বাংলার রেনেসাঁসের, নবযুগের মোহনায় দাঁড়িয়ে সে তখন তার নিজস্ব পথানুসন্ধান করেছিল। বাংলার রেনেসাঁসের, নবযুগের মোহনায় দাঁড়িয়ে সে তখন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের সূত্রে বাংলা কথাসাহিত্যের জন্মসম্ভাবনা সূচিত হল। বাংলা গদ্যের বিকাশ এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে। একদিকে যখন নবজাগ্রত সমাজজীবন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আলোড়িত হয়ে উঠছে, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাধনায় তখন উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষাও গড়ে উঠেছে। তখন আর পুরোনো কাহিনিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না বাঙালি, বাংলা সাহিত্যেও ইংরেজি আদর্শে উপন্যাসের জন্ম হল।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস মুক্তি পেল, সার্থক শিল্পিত উপন্যাসের জন্ম হল। তবে এর আগে ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদ-ভূদেব-কৃষ্ণকমল প্রমুখের হাত ধরে বাংলা উপন্যাসের জন্ম সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। তবে ভবানী-প্যারীচাঁদের সমাজচেতনা ব্যঙ্গের পথ ধরায় তাঁদের হাতে জীবনের গাঢ় সমগ্রতা অবহেলিত হল, সমাজ বাস্তবতার পথে বাংলা উপন্যাসের বিকাশ বাধা পেল। কারণ ব্যঙ্গ প্রাধান্য উপন্যাসের একটি গৌণ বৈচিত্র্য মাত্র হতে পারে, মুখ্য ধারা হয়ে ওঠে না কখনও। আসলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে একদিকে গদ্য-নকশা, অন্যদিকে প্রহসনের প্রাচুর্য ভবানী-প্যারীচাঁদের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা আত্মসাৎ করে নিল। আবার ইতিহাসে কল্পনায় মিশিয়ে যে গল্প-ভূদেব-কৃষ্ণকমল লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগরের কাহিনির সঙ্গে তার একদিকে খানিকটা সাজুয্য ছিল। কিন্তু অনির্দেশ্য পৌরাণিককাল থেকে নির্দিষ্ট

ইতিহাসের অতীতে গল্পকে নামিয়ে আনলেন ভূদেব-কৃষ্ণকমল। কল্পনা তাতে অবাধ রইল কিন্তু বিশ্বাস্য হল। এঁরা পুরাতন নরনারীতে আধুনিক মানবসত্য আবিষ্কার করলেন। এভাবেই বঙ্কিমের ভূমিকা তৈরি হল। কিন্তু ভূদেব-কৃষ্ণকমল থেকে বঙ্কিমের ব্যবধান অনেক। তাঁদের নিশ্চিত অনুসরণ বঙ্কিমে নেই, কারণ আধুনিক জীবন বাস্তবতা ও সমাজ বাস্তবতার দাবি তাঁকে পীড়িত করেছিল। নবজাগরণের ফলস্বরূপ প্রবৃত্তিমুখী মানবচিত্তকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে তাই আঙ্গিক, বিষয় এবং ভাষা এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই সংস্কার সাধনের প্রয়াসী হলেন বঙ্কিম। আমরা এখন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ধারা আলোচনা করব।

২.১ উদ্দেশ্য (Objective)

শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেই উপন্যাস একটি আধুনিক আঙ্গিক। উনিশ শতকে বাংলার সমাজজীবনে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হল তখনই বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব হল। আর উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশের ধারাপথেই বাংলা ছোটোগল্প আবির্ভূত হল। আধুনিক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনের ধারাপথটিকে অনুসরণ করব। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের রচনাকর্মের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা অনুসন্ধান করব তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের কারণসমূহ, বিভিন্ন কালপর্বে বাংলা উপন্যাসে যে বিশিষ্ট শিল্পলক্ষণ ধরা পড়েছে— সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব।

২.২ বঙ্কিমচন্দ্র

উপন্যাস এমন একটি বিশেষ শিল্প যাতে মানুষকে তার নানাবিধ সংকটের পটভূমিতে স্থাপন করা হয়; সে তার সমগ্র সত্তাটি নিয়েই উপন্যাসে ধরা পড়ে। জীবনের উপরিতল এবং অন্তঃপ্রদেশের আন্দোলন সহ সকল মনুষ্য- রহস্যেরই অনাবৃত প্রকাশ ও বিশ্লেষণ সাধারণত উপন্যাসের অন্বিষ্ট। উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় জীবনের সমগ্র ছবি; — যে জীবন শুধু ব্যক্তির নয়— তার কালের, দেশেরও বটে। আধুনিক উপন্যাসের এই সমস্ত দাবি বঙ্কিমের হাতে অনেকাংশেই পূর্ণতা লাভ করল।

বঙ্কিমের কথাসাহিত্য দুটি ধারায় প্রবহমান— রোমান্স ও উপন্যাস। উপন্যাসের উপজীব্য চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিলতা, রোমান্সে কল্পনার অবাধ বিস্তার, অবিশ্বাস্য, অনৈসর্গিক, অদ্ভুত, অলৌকিক বিষয়ের বিচিত্র সমাবেশ। বঙ্কিমের উপন্যাস এবং রোমান্সও এর ব্যতিক্রম নয়। রোমান্সে চরিত্র-বিকাশের দিকে তাঁর লক্ষ ছিল কম। তিনি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সগুলির সমান্তরালেই রচনা করেছিলেন অতিক্রান্ত সমাজ বা পরিবারজীবন কেন্দ্রিক জটিল উপন্যাস। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস ইংরেজিতে 'Rajmohan's wife' (১৮৬৪)। এর কাহিনি পরিবারজীবন কেন্দ্রিক, রোমান্সসুলভ অতিকল্পনা এতে নেই। মাত্র বাইশ বৎসর সময়সীমার মধ্যে বঙ্কিম রচনা করেছিলেন ১৪টি উপন্যাস। তাঁর

উপন্যাসের কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নরূপ ঃ

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭)
মৃণালিনী (১৮৬৯)
বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
ইন্দিরা (১৮৭৩)
যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)
চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)
রজনী (১৮৭৭)
কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
রাজসিংহ (১৮৮২)
আনন্দমঠ (১৮৮২)
দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)
রাধারাণী (১৮৮৬)
সীতারাম (১৮৮৭)

পণ্ডিতপ্রবর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসগুলির বিষয় এবং আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বিচার করে এগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন।

(ক) ইতিহাস ও রোমান্স ঃ এতে আছে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', ও 'সীতারাম'।

(খ) তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস ঃ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'।

(গ) সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস ঃ 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী', ও 'রাধারাণী' এই পর্যায়ের অন্তর্গত। তবে 'ইন্দিরা' ও 'রাধারাণী' এই দুটি কাহিনি আকৃতিতে উপন্যাসের পূর্ণতা ও লক্ষণ প্রাপ্ত হয়নি। এই দুটি অনেকটা বড়ো গল্পের মতো, ইংরেজিতে যাকে বলে নোভেলেট— অর্থাৎ ছোটো মাপের নভেল।

উপর্যুক্ত শ্রেণিবিন্যাস সূত্র অনুসরণ করে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির আলোচনা করতে পারি। তবে, এই শ্রেণি বিন্যাস, যে বিতর্কের ঊর্ধ্বে এমন দাবি অসংগত। কারণ একটি পর্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে অন্য পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়।

ইতিহাস ও রোমান্স শ্রেণিভুক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে লেখা 'রাজসিংহ'ই একমাত্র উপন্যাস। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'সীতারামে'র পটভূমিতে যদিও ঐতিহাসিক কাহিনি ও চরিত্র আছে, কিন্তু ইতিহাসের পটে অনৈতিহাসিক মানুষের কথাই এগুলিতে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে বাংলার পাঠান-মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, 'কপালকুণ্ডলা'য় মোগল শাসনে জাহাঙ্গীরের আমল, 'মৃণালিনী'তে বাংলায় তাতার-তুর্কির আক্রমণ, 'চন্দ্রশেখরে' মিরকাশিমের সমসাময়িক ঘটনা এবং 'সীতারামে' মোগল আমলের শেষাংশ পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যুগলাঙ্গুরীয়'-তে হিন্দু আমলের আবহাওয়া থাকলেও সন

তারিখযুক্ত ইতিহাসের কোনো প্রভাব নেই।

ইতিহাস এবং রোমান্স-কল্পনার মিশ্রণে যে উপন্যাসগুলি বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যদায় সেগুলো ভূষিত না হলেও শিল্পবস্তু হিসাবে এগুলোর সার্থকতা প্রশ্নাতীত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনিতে স্কটের Ivanhoe বা ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র কিছু প্রভাব আছে। কাহিনিগত কিছু সাদৃশ্যও এগুলিতে বর্তমান। তবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র রসবস্তু ও নির্মিতিকৌশল বঙ্কিমের নিজস্বতার দ্যোতক। এর রচনারীতিতে কিছু জড়তা ও ত্রুটি আছে। চরিত্র-দ্বন্দ্বের তুলনায় কাহিনি বয়নকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে উপন্যাসের চেয়ে রোমান্স-লক্ষণই এতে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলাতেই রোমান্স-লক্ষণ প্রবল, কিন্তু এতে রোমান্সের পাশাপাশি চরিত্রের সমস্যা, মানবপ্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং নিয়তিতাড়িত মানব-ভাগ্যের নিদারুণ পরিণাম কখনও কাব্যময়তার মাধ্যমে, কখনও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের দ্বারা, কখনও আবার-নাটকীয় চমৎকারীত্বের সাহায্যে হওয়ায় এর কাহিনি এক অনবদ্য রসরূপময়তা লাভ করেছে। প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার সামাজিত জীবন, তার বিবাহ, দুর্জ্ঞেয় নিয়তির নির্দেশে কীভাবে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল, কীভাবে তার স্বামী নবকুমার অজ্ঞাতসারেই ঘটনাচক্রকে বেগবান করে তুলল— এই সমস্ত বিচিত্র কাহিনি ও চরিত্র এই উপন্যাসে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'র তিন বৎসর পরে প্রকাশিক 'মৃণালিনী' বাংলায় মুসলমান অভিযানের পটভূমিকায় নির্মিত এক কাল্পনিক কাহিনি। এর কাহিনিগ্রন্থন ও চরিত্রবিন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'-র তুলনায় নিকৃষ্ট। যদিও হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেমকাহিনি এতে প্রাধান্য লাভ করেছে তবুও কাহিনিগ্রন্থনে লেখকের নৈপুণ্য মনোরমা ও পশুপতির কাহিনিতেই অধিকতর প্রস্ফুটিত। 'যুগলাঙ্গুরীয়' হিন্দু আমলের পটভূমিকায় স্থাপিত একটি প্রেমমূলক রোমান্টিক বড়ো গল্প। কাহিনি ও চরিত্র কোনোদিকেই উপন্যাসলক্ষণ সর্বাংশে ধরা পড়েনি। 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম' এই তিনটি উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকা সতর্কতার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। যেখানে ইতিহাস অনুপস্থিত সেখানে লেখক ইতিহাসের অনুকূল কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূল অভিপ্রায় নৈতিক তত্ত্ব অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কের শ্রেষ্ঠত্ব। মিরকাশিম ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় এর কাহিনিটি উপস্থাপিত। প্রতাপ-শৈবলিনীর আকর্ষণ এবং শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের আদর্শ চরিত্র এর প্রধান বক্তব্য। এই উপন্যাসে বঙ্কিম কিছুটা নীতি ও সংযমের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। নীতিবাদী বঙ্কিম এখানে নীতির মাপকাঠিতে প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্ক বিচার করেছেন এবং চিত্তসংযমে অসমর্থা শৈবলিনীকে মানসিক নরকযন্ত্রণা ভোগের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিয়েছেন। উপন্যাসের শিল্পত্ব এতে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'রাজসিংহ' বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর কাহিনি ও প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক এবং সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেবের বিবাহের ইচ্ছা এবং সেই সূত্রে রানা রাজসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ, যুদ্ধে রাজসিংহের জয়লাভ ও চঞ্চলের সঙ্গে বিবাহ— এই ইতিহাস-অনুমোদিত ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটির আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে। বঙ্কিম মূল ঘটনার সঙ্গে জেব-উন্নিসা-মোবারক-দরিয়াবিবি সংক্রান্ত একটি উপকাহিনিও সংযোজিত করেছেন। এই অংশে ইতিহাস, লেখকের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, তাই শিল্পী বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে এই অংশটি অধিক সমুজ্জ্বল ও রসোত্তীর্ণ।

'সীতারাম' উপন্যাসে ঐতিহাসিক কাহিনি ও পটভূমিকা থাকলেও ঐতিহাসিক চরিত্রে কল্পনার অতিশয্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে। রূপজ মোহের তাড়নায় চরিত্রবান পুরুষের অধঃপতনের চিত্রই এতে অঙ্কিত হয়েছে। সীতারাম চরিত্রটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হলেও বঙ্কিম প্রতিভার দীপ্তি এই উপন্যাসে অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়েছে।

'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। 'আনন্দমঠে'র প্রধান ও প্রবল সুর দেশাত্মবোধ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত দেশ, সমাজ, ধর্ম, ও জাতীয়তা সম্বন্ধীয় বঙ্কিমের যে নতুন চিন্তা ও তত্ত্বদর্শন, তা এই উপন্যাসদুটিতে ছায়াপাত করেছে। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অবলম্বন করে বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' দেশাত্মবোধের মহাকাব্য রচনা করেন। 'বন্দেমাতরম সংগীতটিও এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই উপন্যাসে বঙ্কিম সন্ন্যাসীদের উত্থান প্রসঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে ভারতীয়দের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধতার কথাই বলতে চেয়েছেন। এর অগ্নিগর্ভ দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গ স্বাধীনতা-সৈনিকদের উদ্দীপিত করেছিল। 'বন্দেমাতরম' পরবর্তীকালে সমরসংগীতে পরিণত হয়েছিল। তবে স্বদেশিকতা ও আদর্শবাদের বিচারে এক ক্রান্তিকারী ঐতিহাসিক পর্বনির্দেশক হলেও কলালক্ষণ বিচারে উপন্যাসটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এর কাহিনি গ্রন্থন শিথিল; শান্তি ও ভবানন্দ ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়নি। তাছাড়া সন্ন্যাসী হাঙ্গামার মতো লুঠতরাজের বিশৃঙ্খল ঘটনাকে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আধারে পরিবেশন করার ফলে কাহিনির বস্তুগত যথার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'দেবী চৌধুরাণী' পুরাতন বাংলার সমাজ ও পারিবারিক পটভূমিকায় স্থাপিত এক মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনি। এই কাহিনির অন্তরালে আছে গীতাতত্ত্বে-নিষ্ণাত তাত্ত্বিক বঙ্কিমের এক সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও কুলবধূর ভয়ঙ্কর দস্যুনেত্রী দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হওয়ার এই কাহিনির পিছনেও অল্পবিস্তর স্থানীয় ঘটনা ছায়াপাত করেছে। প্রফুল্ল দস্যুনেত্রীতে পরিণত হয়ে প্রচুর ঐশ্বর্য ও প্রতাপের অধিকারিণী হলেও গুরুর কাছে থেকে গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে নারী জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করল। তৎপরে সমস্ত ঐশ্বর্য ও শক্তি পরিত্যাগ করে সে আবার স্বামীর ঘরে ফিরে এল— উপন্যাসটির কাহিনিভাগ এতটুকুই। এর বিচিত্র কাহিনিবয়ন প্রশংসনীয় কিন্তু চরিত্রবিকাশ আশানুরূপ নয়। গীতাতত্ত্ব এবং হিন্দু নারীর যথার্থ স্থান সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশাবলি উপন্যাসের পক্ষে অবান্তররূপে প্রযুক্ত হয়েছে। 'ইন্দিরা' ও 'রাধারাণী'তে বাঙালি পরিবারের মসৃণ ঘরোয়া কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এতে কাহিনি বিন্যাসে নতুনত্ব নেই, চরিত্রে অর্ন্তলীন মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণও অনুপস্থিত। এই দুটি কাহিনি উপন্যাসের পূর্ণতা পায়নি। এই দুটির আখ্যানভাগ প্রসন্ন, সহজ ও সরল, —যা সহজেই পাঠকের প্রীতি উৎপাদন করতে সক্ষম। নানা বিপত্তির পরে ইন্দরার সঙ্গে স্বামীর মিলন এবং রাধারাণী নামে এক বালিকার বাল্যপ্রেমের অনুরাগের সফলতা আখ্যান দুটিতে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রদ্বন্দ্ব না থাকলেও সুখপাঠ্য বড়োগল্প হিসাবে এখনও এগুলির জনপ্রিয়তা আছে।

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী' এই তিনটি উপন্যাসের উপজীব্য নরনারীর আদিম সম্পর্কের জটিলতা। 'বিষবৃক্ষে'-র পাত্র-পাত্রী সমকালীন যুগের মানুষ। এই উপন্যাসের মূল বিষয় বিধবার প্রণয়। প্রথমা পত্নী সূর্যমুখী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনী নামে বাল্যবিধবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিত্তের দুর্নিবার প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে

সঁপে দিলেন। স্বামীর এই আচরণে ব্যথিতা সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলে সংসারে জটিলতার সৃষ্টি হল। পরে নগেন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন এবং সূর্যমুখী ফিরে এলেন। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীর উপেক্ষায় বিষপান করে আত্মহত্যা করল। এই উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দ সম্পর্কের মধ্যে রূপজ মোহ এবং তার ফলভোগের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমের বিধবাবিবাহ বিরোধী মানসের ফলশ্রুতি এই উপন্যাস। কারণ, চরিত্রশুদ্ধি এই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। এতে নিষিদ্ধ কামনার উদ্দামতা আছে, আছে চরিত্র-দ্বন্দ্ব; কিন্তু বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে এটি উৎকৃষ্ট নয়। এতে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের তুলনায় রোমান্টিক ধরনের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কন অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক সৃষ্টি। এই উপন্যাসের বিষয়ও পুরুষের আত্মসংযমে অনিচ্ছা, স্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে মত্ত হওয়া এবং তার পরিণাম। ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিনীর সঙ্গে বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী-নগেন্দ্র-কুন্দের কাহিনির মিল বহুলাংশে বর্তমান। এই কাহিনিতে শুধু পরিণতি ও প্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়েছে। এই উপন্যাসের শেষে গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎ সাধনার দ্বারা শান্তিলাভ উপন্যাসের শিল্প পরিণতিকে আঘাত করেছে। তবে এই উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থন ও চরিত্র সন্নিবেশে বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। নারীর আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব, পুরুষের নৈতিক অধঃপতন— ইত্যাদি বিষয় এতে অত্যন্ত মনস্তত্ত্ব সম্মতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তবে উপন্যাসের পরিণতিতে আর্ট ও মরালিটির দ্বন্দ্বে সমাজনীতির রক্ষক নীতিবাদী বঙ্কিম আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই রোহিনীর পরিণাম স্বভাবসংগত হলেও আর্টসংগত হয়নি এবং এতে শিল্পকলাগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন রচিত The Last Days of Pompeii উপন্যাসের অন্ধ ফুলওয়ালি নিদিয়ার চরিত্রের আংশিক প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান্ধ রজনী চরিত্র অঙ্কন করেন। নানা ঘটনার মাধ্যমে শচীশ এবং রজনীর বিবাহ, তারপর কোনো মহাপুরুষের কৃপায় রজনীর দৃষ্টিলাভ এটুকুই উপন্যাসের মূল আখ্যান।

বস্তুত বঙ্কিমের হাতেই বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ও প্রতিষ্ঠা। ভাব-ভাষা-বিষয়-আঙ্গিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই যে পালাবদলের চিহ্ন সূচিত হয়েছিল বঙ্কিমের মাধ্যমে, তাই পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসে বিচিত্র ফসল ফলিয়েছে। সচেতন শিল্পীর সতর্ক পদচারণার মাধ্যমেই বাংলা উপন্যাস এভাবে শুরুতেই এক বিশিষ্ট ও বিচিত্র ব্যাপক আঙ্গিকে সুস্থিত হয়েছিল। এজন্যেই বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের আদিগুরুর শিরোপা লাভ করেন, আর এখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

২.৩ রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষায় উপন্যাস প্রথম সম্পূর্ণ অবয়ব ও স্বভাবধর্ম নিয়ে উপস্থিত হল বঙ্কিমের রচনায়। তাঁর উপন্যাসেই বাঙালির জীবন সচেতনতার কথা স্পষ্টরূপে শুনতে পাওয়া গেল। তিনি মূলত বাঙালির পারিবারিক জীবনের তৎকালীন শৃঙ্খলাবোধকে উপন্যাসে রূপদান করেছেন। আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বঙ্কিম-উপন্যাসের উপজীব্য। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বকেই তিনি পারিবারিক জীবন

কাঠামোয় ধরতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর পরে। রবীন্দ্রনাথ অসংস্কৃত পারিবারিক জীবনের কথাকার নন, তাঁর উপন্যাসে পরিবার এক আধুনিক অবয়ব নিয়ে আবির্ভূত। ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নয়— ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বই রবীন্দ্র-উপন্যাসে বেশি স্ফুটতর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে পরিবর্তনশীল মধ্যবিত্ত সমাজের এবং প্রধানত নাগরিক জীবনের ছবি এঁকেছেন। উনিশ শতকের বাংলাদেশের আধুনিক মানুষকে নিয়েই তিনি তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন। কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি জীবনে যে নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল এবং নতুন শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ ও জটিল মানুষের উদ্ভব হয়েছিল, উপন্যাসের বিষয় হিসাবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন সেই নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত মানুষেরই সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনসমস্যাকে। এই নবগঠিত সমাজের সুখ-দুঃখ, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, নানা আদর্শের বিরোধ, নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ— ইত্যাদিই হল তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। এছাড়া হিন্দু-ব্রাহ্মের ভাব-সংঘাত, রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তির অন্তর্মুখীনতা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক চেতনাকে সমগ্রতা দান করেছিল।

ঔপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা 'চোখের বালি' উপন্যাসে। কিন্তু নিতান্ত কৈশোর বেলাতে মাত্র ষোলো বৎসর বয়সেই তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রচেষ্টা 'করুণা'। করুণা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। উপন্যাসটি রূপধর্মে সফল হয়ে ওঠেনি, তবুও এই প্রথম উপন্যাসটিই রবীন্দ্র-জীবনভাবনার মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রাথমিক স্বাক্ষর বহনকারী। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সমসাময়িক। সমকালীন সমাজের নিষ্ঠুর আবর্তের মধ্যে এক মধুর নমনীয় ও সরল প্রাণের যন্ত্রণা এই উপন্যাসে রূপলাভ করেছে। 'করুণা'তে সমাজ বিবর্তনের কথা অপেক্ষা সমাজ নিপীড়নের ছবিই বেশি। ডঃ সুকুমার সেন উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "করুণা অপরিণত রচনা হইলেও ঐতিহাসিক মূল্যবর্জিত নয়। মোহিনী মহেন্দ্রর অপ্রধান কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইলের ছায়া এবং চোখের বালির পূর্বাভাস আছে। 'করুণার মহেন্দ্র ও রজনী পরে চোখের বালির মহেন্দ্র ও আশাতে পরিণত।"

যেহেতু 'করুণা' উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, তাই 'বউঠাকুরাণীর হাট'কেই (১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা যায়। এই উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে বাংলাদেশের ইতিহাসের কাহিনি অনুসৃত হয়েছে। প্রতাপাদিত্য, রামচন্দ্ররায়, বসন্তরায়, প্রভৃতি ব্যক্তিনাম যদিও বাংলার ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বের সঙ্গে জড়িত এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাও এতে স্থানলাভ করেছে, তবু একে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। এতে প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য, বসন্তরায়, উদয়াদিত্য এবং বিভার গল্পই প্রাধান্য পেয়েছে, —যা ইতিহাস বহির্ভূত। প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতায় কী ভাবে পিতৃব্য প্রাণ হারালেন, সদ্য বিবাহিত কন্যার দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল, তার অন্তঃপুরের শান্তি বিঘ্নিত হল— এই উপন্যাসে সেই কাহিনি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন। এর কাহিনি গ্রন্থন ও চরিত্রদ্বন্দ্ব উচ্চমানের নয়। বিভিন্ন চরিত্রে বিপর্যয়ের মূলে আছে প্রতাপাদিত্যের নির্মমতা। এতে উচ্চশ্রেণির উপন্যাসের কলা-কৌশল ফুটে ওঠেনি।

'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। দেবীমন্দিরে

বলিদান বিরোধী রাজা গোবিন্দমাণিক্যর সঙ্গে পুরোহিত রঘুপতির যে দ্বন্দ্বের ভূমিকায় উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ইতিহাসসম্মত। কনিষ্ঠ রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের ষড়যন্ত্র, রঘুপতির ব্রাহ্মণ্য দম্ভ এবং সবশেষে তাঁর মনে বাৎসল্যরসের উদয়ের কাহিনি এই উপন্যাসে উদারতম মানবধর্মের পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য সহানুভূতিশীল মন নিয়ে যে যথার্থ প্রজাহিতকর কাজ করেছেন এবং উপন্যাসের শেষে যে জয় ঘোষিত হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ধর্মচেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে। রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে একই সঙ্গে উপন্যাসের ভাববস্তু স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে ও চরিত্র দুটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। স্ত্রীভূমিকা বর্জিত এই উপন্যাসটিতে প্রথম পরিণত শিল্পকৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'রাজর্ষি' প্রকাশের দীর্ঘ ষোলো বৎসর পরে বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। 'চোখের বালি'তে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের নতুনত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বঙ্কিম যুগের অবসান ও আধুনিক উপন্যাসের শুরু 'চোখের বালি' থেকেই। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন মানুষের জটিল মানসভূমির জটিলতা প্রকাশ করলেন এই উপন্যাসে। বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক টানাপোড়েন এই উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী এই চারজন মানুষের জীবনের সমস্যাবহুল ঘটনাপ্রবাহ, সমস্যার গ্রন্থিমোচনকে কেন্দ্র করে এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অবচেতন সত্তার নিগূঢ় ইঙ্গিত, সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংঘাতের ফলে নারীর জীবন যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় রবীন্দ্রনাথ তা নিপুণতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন। কঠোর বাস্তবকে অনুসরণ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এই উপন্যাসকে স্বাদু করে তুলেছে।

'চোখের বালি'র পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)। এর কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব নেই। এই উপন্যাস অনেকটা রোমান্সধর্মী। একটি আপতিত ঘটনার উপর ভিত্তি করে রমেশ, হেমনলিনী ও কমলাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাধারা এতে বর্ণিত হয়েছে তা উপন্যাসের দাবি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি সর্বাংশে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা রক্ষিত হয়নি। এর কাহিনিতে অপরিপক্কতার চিহ্ন আছে, চরিত্রগুলিও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠেনি।

'গোরা' প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। বহু চরিত্র ও ঘটনার বৈচিত্র্য নিয়ে একটি বিশেষ দেশের, বিশেষ সময়ের এক জীবন্ত আলেখ্য রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। বিশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। সে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বাঙালি ও ভারতীয় জীবনধারার সার্বিক এবং সামগ্রিক উন্নয়ন, শুধু শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই আন্দোলন রাজনৈতিক দলাদলি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদী হিংসা, স্বদেশিয়ানার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত লোভ লালসা এবং হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিতে পরিবর্তিত হয়ে জাতির শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে নিল। এই উপন্যাসে সামসাময়িক এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নরনারীর জীবনসমস্যা উদারতর মানববোধের পটভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। এক গোটা জাতির মানসিক সংকটের কাহিনি এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য। এর ঘটনাবস্তুও খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কৃষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র গোরা আসলে আইরিস সন্তান। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তার জন্মের পর তার বিদেশিনী মা মারা গেলে কৃষ্ণদয়ালবাবু তাকে নিজের সন্তান বলে প্রচারিত করেন, গোরাও তাই জানত। সে যেন উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিভূ। ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, হিন্দুর আচার-আচরণ নিষ্ঠাভরে পালন করাই তার কাছে দেশসেবা। এই উগ্র জাতীয়তাবাদী গোরার মানবিক পরিবর্তন, মানসিক রূপান্তর এবং যথার্থ ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং আত্মোপলব্ধিই কাহিনির নাটকীয় সমাপ্তি রচনা করেছে। গোঁড়া হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী রূপে গোরাকে এঁকেও রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত তাঁকে বিশ্বমানবরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গোরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম, ভারতচিন্তা তথা বিশ্বাসবোধের প্রতীক।

১৯১৬ তে রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্রে'। উপন্যাস দুটি 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরেবাইরে'। 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় লেখা শেষ উপন্যাস আর 'ঘরেবাইরে' চলিত ভাষায় প্রথম উপন্যাস। 'চতুরঙ্গে'র আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেননি। 'চতুরঙ্গ'তেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের আঙ্গিক সমৃদ্ধতার সূত্রপাত। এতে চারটি অংশ রয়েছে— জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস। এই চারটি অংশের বক্তাই শ্রীবিলাস আর এ উপন্যাস মূলত শচীশের ভাঙাগড়া এবং আত্মোপলব্ধির ইতিহাস। শচীশের জীবনসাধনার সঙ্গে দামিনীর অদম্য তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষার সংঘাত যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং তার আবর্তে এই চারটি চরিত্র কীভাবে ঘূর্ণীমান হয়েছে— এই উপন্যাসে সেই কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। চতুরঙ্গে শচীশ-দামিনীর যে বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের আভাস ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা শুধু মনোবিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। চেতনার অন্তরালে যে রসধারা বহমান, আমাদের দেশের সহজিয়া সাধকরা যে রসের রসিক, শচীশের মতো মানবতত্ত্বে বিশ্বাসী আধুনিক যুবকও লীলানন্দস্বামীর দামিনী শচীশকে রূপচেতনা ও পার্থিব সত্তার মধ্য দিয়ে কামনা করে। এই বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্ব তীক্ষ্ণ ও রহস্যময় ব্যঞ্জনার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্র, ঘটনা ও বর্ণনার সমবায়ে জীবনের ব্যাপক চিত্র না এঁকে রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু ভাষার ইঙ্গিত ও দ্যুতিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন জীবনের ও মননের গভীর উপলব্ধিগুলিকে। এই মানদণ্ডে বস্তুত, চতুরঙ্গই হল ভারজিনিয়া উল্‌ফের প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবাদী উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে দাম্ভিক দেশপ্রেম কীভাবে শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয় তারই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ঘরেবাইরে' উপন্যাস রচনা করেন। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ ও নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ-এই ত্রিভুজের কাহিনি মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ বিকর্ষণের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছে। বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ প্রত্যেকেই নিজেদের আত্মকথার মধ্য দিয়ে তাদের তিনজনকে নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে। এই বিশ্লেষণ যেমন আত্মবিশ্লেষণ তেমনি অপরের মনোবিশ্লেষণও বটে, এবং এর সমস্তটাই স্বদেশিয়না ও প্রেমবাসনা— এই দুই স্তরেই ঘটেছে। এই উপন্যাসে একদিকে বিমলা চরিত্রে দুই পুরুষের আকর্ষণ, অন্যদিকে উগ্র স্বাদেশিকতার নগ্নমূর্তি ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ লোভী স্বাদেশিকতার বীভৎস পরিচয় প্রদান করেছেন। এই উপন্যাসে চরিত্রদ্বন্দ্ব, উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণাম এবং নারীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে

তিনিই সর্বপ্রথম প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে এক যুগের বাঙালি জীবনের লিপিচিত্র অঙ্কন করেছেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'যোগাযোগ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। চাটুয্যে ও ঘোষাল পরিবারে পুরুষানুক্রমিক বিদ্বেষের ভূমিতে কুমুদিনীর সকরুণ আত্মদানই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই উপন্যাসের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি লক্ষণীয়। কুমুদিনীর চরিত্রে তার অগ্রজের স্নিগ্ধ-মধুর অভিজাত্য মণ্ডিত প্রভাব অন্যদিকে স্থূল রুচির মধুসূদনের স্থূল আকাঙ্ক্ষার অশুচি পীড়ন এবং এই দুয়ের দ্বন্দ্ব ও তার পরিণাম এই উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন-বিপ্রদাস কুমুদিনী কারোরই অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করেননি, শুধু অসংখ্য নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসকে পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। চরিত্রগুলিতে বৈচিত্র্যের অভাব রয়েছে, একতরফা মানসিক সংঘাত প্রদর্শনের ফলে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সধর্ম থেকে এটি বিচ্যুত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে রচিত কাব্যধর্মী ও রোমান্স আশ্রিত 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের আখ্যান এই কাহিনির প্রধান উপাদান হলেও কবি এতে একটি গভীর তাৎপর্য সংযোজিত করেছেন। দৈনন্দিন বিবাহিত জীবনের কর্তব্যভারগ্রস্ত গতানুগতিকতা এবং অপার্থিব রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নাভিসার-এ দুই এর মধ্যে মিল ঘটানো অসম্ভব। তাই অমিত ও লাবণ্য পরস্পরের প্রেমকে প্রয়োজনের দ্বারা মলিন করল না, একে অপরকে ভালোবেসেও তারা প্রণয়াবদ্ধ হল অন্যের সঙ্গে। ঘড়ার জলে তৃষ্ণা মিটল, কিন্তু সমুদ্রজলের অশ্রুলবণাক্ত আস্বাদ উভয়ের মনে সুখ-সৌভাগ্যের মতো বেঁচে থাকল। এই তত্ত্ব যাই হোক না কেন, এর কাব্যধর্মী বর্ণনা, তির্যক বাক্‌বিন্যাসের নিপুণতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বর্গলোক রচনা এবং তা থেকে স্বেচ্ছানির্বাচনের সকরুণ বেদনা উপন্যাসটিতে অনবদ্য রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

জীবনের প্রায় শেষপর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ পর পর তিনটি ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস রচনা করেন। —'দুইবোন', 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) যথার্থ উপন্যাসের আকার লাভ করতে পারেনি। এই দুটি আসলে ছোটোগল্পের আখ্যান। 'দুইবোন' উপন্যাসটির গঠন শিথিলবদ্ধ। ঘটনাধারাও পূর্বপরিকল্পিত। এর পরিবেশনরীতিতেই রবীন্দ্রনাথ যত্নশীল ছিলেন না। নারী-দুইরূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে— প্রিয়ারূপে আর জননীরূপে। প্রধানত এই তত্ত্বটিই 'দুইবোন'-এর শর্মিলা, ঊর্মিবালা ও শশাঙ্কর কাহিনির মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে; আর এই সমস্যাই একটু ভিন্ন দিক থেকে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা, সরলা ও আদিত্যর জীবনে রূপায়িত হয়েছে। এই দুটি উপন্যাসেই মূলত ছোটোগল্পের কলমে লেখা। ঘটনা ও চরিত্রে পরিপূর্ণতা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুধু আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে এগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' (১৯৩৫)। আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কবলে নরনারীর আপন স্বরূপ কী ভাবে বিপর্যস্ত হয় তারই মর্মান্তিক ভাষ্য এতে রচিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক নায়িকা অতীন ও এলার সেই ব্যর্থতার কথা উপন্যাসের চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অতীনের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিরুদ্ধ শক্তির পীড়নে তার মর্মান্তিক বিক্ষোভ, প্রেম ও বিপ্লববাদের আদর্শের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতময়

জটিল বিরোধ উপন্যাসের প্রাণবস্তু। তবে এর ঘটনা উপন্যাসের মতো পূর্ণ গঠিত নয়, কাহিনি ও উপকাহিনিগুলির মধ্যেও সংহতির অভাব আছে। বার্ধক্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের ভাষা যথেষ্ট কৃত্রিম, ঘটনা সন্নিবেশে নেই কোনো সংগতি, সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত চিত্রগুলিও অবিশ্বাস্য। নরনারীর চরিত্রগুলি লেখকের ভাবকল্পনার বাহন হয়ে উঠেছে সুতরাং উপন্যাসে বাস্তব ঘটনার চেয়ে কাল্পনিক বর্ণনা অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে ঘটনাপ্রবাহ অতিনাটকীয়তার আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকতা বিপর্যস্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, কাব্যরসেই বস্তুত তাঁর আত্মার মুক্তি। তাই তাঁর অনেক উপন্যাসে বাস্তব চিত্রগুলি কল্পনার রঙে রঙিন। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তাও শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই অধিকতর সীমাবদ্ধ। তাঁর উপন্যাসধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 'চোখের বালি'র পরবর্তী উপন্যাসগুলির পাত্রপাত্রী সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যদিও তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা কেউই উর্দ্ধলোকের জীব নয় তবু তাদের জীবনসমস্যা সাধারণের সীমায় আবদ্ধ নয়। সেজন্য রবীন্দ্র উপন্যাসের সার্থক উত্তরাধিকারও পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। ঔপন্যাসিক উপাদান ও কবিত্বের যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটলেই আবার এইজাতীয় সৃষ্টিসম্ভার পাওয়া সম্ভব।

২.৪ রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী অন্যান্য ঔপন্যাসিক

বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির নবযুগচেতনা একটি নতুনধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতে আমরা সেই চেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করেছি। বাংলা উপন্যাসের বিভিন্ন ও বহু-বিচিত্র রূপের পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ এবং রোমাঞ্চের পরিকল্পনা, ইতিহাসের অতীত পরিবেশ রচনা ও বাস্তব জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার চিত্র অঙ্কন করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছেন। বঙ্কিমের পথ অনুসরণ করে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা (রবীন্দ্র-পূর্ব ঔপন্যাসিক) উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হলেও সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তবে রমেশচন্দ্রের মতো দু-একজন ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) ঃ

সমসাময়িকদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু স্বভাবে তিনি শিথিল ও অলস প্রকৃতির ছিলেন বলে তাঁর প্রতিভার বিকাশ সেভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি। সঞ্জীবচন্দ্রের শিল্পসত্তার মূলে ছিল সূক্ষ্ম কৌতূহলবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি এবং নির্মল ও গভীর রসবোধ। সৌন্দর্যপ্রিয় ও কল্পনারসিক সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় পরিহাস- রসিকতা এক বিশেষ মাত্রা দান করেছে। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হ'ল - 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭), 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩), 'মাধবীলতা' (১৮৭৭) ইত্যাদি। 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭) উপন্যাসের বিষয়বস্তু

হল নায়িকা শৈল তার নিজের দোষে কীভাবে শোচনীয় মৃত্যু ডেকে এনেছে তার স্বরূপ অঙ্কন। অন্যদিকে 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের পূর্ববর্তী কাহিনি রচিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'মাধবীলতা'য় (১৮৮৫)। তাই 'মাধবীলতা' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন "কণ্ঠমালা মাধবীলতার পরিশিষ্ট"। সিংহশত গ্রামের শেষ জমিদার ইন্দ্রভূপের কাহিনিই এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এর রচনারীতিতে রূপকথার ছাপ লক্ষ করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র আদালতে পুরাতন নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) রচনা করেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার প্রহসন সাধারণ মানুষদের কাছে তুলে ধরে এই উপন্যাসের মাধ্যমে সঞ্জীবচন্দ্র ইতিহাস রচনার করার চেষ্টা করলেও তিনি সফল হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মতো তা 'ক্ষমতার অপব্যয়' ছাড়া আর কিছু নয়।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) ঃ

তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমের সমসাময়িক হলেও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্কিমের প্রতিভার যখন দীপ্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন বাংলা উপন্যাস জগতে আবির্ভূত হন তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তারকানাথের উপন্যাসগুলি হ'ল - 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪), 'ললিত সৌদামিনী' (১৮৮২), 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭), এবং 'অদৃষ্ট' (১৯৯২)। মূলত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের জন্যই তারকানাথ বাংলা উপন্যাস জগতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে অমৃতলাল বসু 'সরলা' নাম দিয়ে এর নাট্য রূপ দান করেন। গ্রামীন সমাজের সুখ-দুঃখময় কাহিনি রচনায় তারকনাথ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বলা যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ঘরোয়া পারিবারিক জীবনের সার্থক রূপায়ণের সূচনা তারকনাথের হাত ধরেই, যার প্রভাব পরবর্তী কালের শরৎচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ঃ

শিবনাথ শাস্ত্রী শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, স্বাধীনতার উপাসক, ধর্মপ্রচারক এবং সর্বোপরি একজন সমাজ-সংস্কারক। বাংলার সমাজ, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত উপন্যাস চারখানি - 'মেজবৌ' (১৮৮০), 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়নতারা' (১৮৯৯) এবং 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬) ইত্যাদি।

'মেজবৌ' উপন্যাসে গ্রামবাংলার পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী বাঙালি জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে 'যুগান্তর' উপন্যাসে। অন্যদিকে মানুষের প্রতি কৌতূহল, বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রকাশ পেয়েছে 'নয়নতারা' উপন্যাসে। সবচেয়ে বড় কথা পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নারী-জীবনকে যেভাবে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন তার পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে শিবনাথের উপন্যাসগুলিতে। সামাজিক উপন্যাসগুলিতে তিনি নারীজীবনকে এক স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ঃ

রবীন্দ্র-পূর্বযুগে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই রমেশচন্দ্রের স্থান। রমেশচন্দ্র দত্ত বোধহয় একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি বঙ্কিমের সমসাময়িক হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জোরে বাংলা উপন্যাস পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বঙ্কিমের মতোই সরকারী উচ্চকর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করার কথা বলেন। ইতিহাসে সমধিক আসক্তি থাকার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে আবির্ভূত হবার আগে ইংরেজিতে নানা মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে তরুণ বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেন। আবার প্রবীণ বয়সে করেন নানা শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ। অথচ এই ব্যক্তি ঐতিহাসিক-সামাজিক মিলিয়ে মোট ছ'খানি বাংলা উপন্যাস লিখেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত নিজের উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন, সে অনুবাদ ইংরেজি-ভাষী সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়ও হয়। তাঁর ছ'খানি উপন্যাসের মধ্যে দুখানি ইতিহাসের পটে আঁকা রোমাণ্টিক কাহিনি। এ দুটি হল— 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) এবং 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭)। দুখানি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস হল— 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯). এবং বাকি দুখানি হল সামাজিক ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস— 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। উল্লিখিত প্রথম চারখানি উপন্যাসে মোগল-ইতিহাসের একশো বছরের চিত্র আঁকা হয়েছে বলে এদের এক সঙ্গে বলা হয় 'শতবর্ষ'।

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) ঃ

বঙ্কিমের সমকালীন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। শিল্পী হিসেবে তিনি উন্নতমানের না হলেও সংখ্যাগত দিক থেকে তিনি প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমানই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল - 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪), 'বিমলা' (১৮৭৭), 'দুই ভগ্নী' (১৮৮১), 'কমলকুমারী' (১৮৮৪), 'প্রতাপসিংহ' (১৮৮৪), 'মা ও মেয়ে' (১৮৮৪), 'শুক্ল-বসনা সুন্দরী' (১৮৮৫-৯০), 'বিষবিবাহ' (১৮৮৮), 'শান্তি' (১৮৯৩), 'যোগেশ্বরী' (১৮৯৮), 'আমার ফসল' (১৯০১), 'কর্মক্ষেত্র' (১৯০২), 'অন্নাপূর্ণা' (১৯০২), 'আদর্শ প্রেম' (১৯১৩) ইত্যাদি।

দামোদর মুখোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় মূলত বঙ্কিমের দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হয়েছেন। ইংরাজি রোমাঞ্চের প্রেরণা তাঁর উপন্যাসে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালপুণ্ডলা'র পরিশিষ্ট হিসেবে 'মৃন্ময়ী' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র পরিশিষ্ট হিসেবে 'নবাবনন্দিনী' রচনা করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তাঁর শিল্প দক্ষতা ছিল না। তাই রোমাঞ্চ রচনায় বঙ্কিমের মতো কৃতিত্বে দেখাতে পারেননি। অন্যদিকে সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে আদর্শবাদের প্রচার করতে গিয়ে বাস্তবতার অভাবে সেগুলি যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৪) ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যোগেশচন্দ্র বসু হিন্দু-সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য সামনে রেখে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনায় ইংরাজি শিক্ষিত নারী-পুরুষ ও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে একট তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে। তাঁর

রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে - 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬), 'বাঙালি চরিত' (১৮৮৫), 'কালাচাঁদ' (১ম- ৫ম পর্ব ১৮৮৯-১৮৯০), এবং 'শ্রী শ্রী রাজলক্ষ্মী' (১৯০২) ইত্যাদি।

'মডেল ভগিনী' উপন্যাসে আধুনিক নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতার প্রতি ব্যঙ্গভাব এবং যুবকদের ফিরিঙ্গিয়ানা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ফুটে উঠেছে। অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য ও ব্যঙ্গের ভাব প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং যোগেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে অত্যাধিক রক্ষণশীলতা ও অগভীর জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠায় সেগুলি যথার্থ শিল্প মর্যদা লাভ করতে পারেনি।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ঃ

রবীন্দ্রনাথের বড় বোন স্বর্ণকুমারী দেবী উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা লেখিকাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কাব্য-গান-উপন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আবার 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের প্রতীক হিসাবে তিনি বাংলা সমাজ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিতে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। উদারনৈতিক চিন্তাধারাই তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম আদর্শ। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হ'ল - 'দীপনির্বাহ' (১৮৭৬), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫) ইত্যাদি।

'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) উপন্যাসের উপজিব্য হ'ল পৃথিরাজ-সংযুক্তা কাহিনি, চিতোররাজের পারিবারিক ইতিহাস এরং মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণের ইতিহাস ইত্যাদি। টডের রাজস্থান সম্পর্কির গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে স্বর্ণকুমারী 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), এবং 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) রচনা করেছে। এর মধ্যে 'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে স্বদেশ-চেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে।

ঐতিহাসিক রোমাঞ্চ চাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী সামাজিক উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাস গুলি হ'ল - 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'মালতী' (১৮৮০), 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮), 'স্নেহলতা (দুইখণ্ডে প্রকাশিত ১৮৯০, ১৮৯৩) এবং 'কাহাকে' (১৮৯৮), 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলন রাত্রি' (১৯২৫) ইত্যাদি। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'স্নেহলতা' সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস এবং 'কাহাকে' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র পূর্বে ভিন্নধর্মী মনোস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এছাড়া তাঁর 'গল্পস্বল্প' (১৮৮৯), 'নবকাহিনী' (১৮৯২) নামে দুটি গল্প সংকলন রয়েছে। কিন্তু ছোটোগল্পের আঙ্গিত সচেতনা না থাকায় সেগুলি সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

উপরে উল্লিখিত ঔপন্যাসিকগণ ছাড়াও রবীন্দ্র পূর্বের আরও বহু ঔপন্যাসিক ছিলেন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাসের স্রষ্টা প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১), 'কল্পতরু' উপন্যাসের স্রষ্টা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) প্রমুখ।

২.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা

আলালের ঘরের দুলাল ঃ

এই গ্রন্থের রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র। এঁর ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)। বাংলা গদ্যের আদিকাল থেকে বঙ্কিম পূর্ববর্তী সময়ে ব্যবহৃত গদ্যকে সাধারণত 'পণ্ডিতী বাংলা' বলা হত। এতে তৎসম শব্দ প্রচুর ব্যবহৃত হত। এই তৎসম শব্দযুক্ত ভাষার পাশাপাশি এক নতুন ভাষারীতির প্রয়োগ করেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি সাধারণের কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

এই গ্রন্থ দুটি কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রথমটি হল এর ভাষা এবং দ্বিতীয়টি হল এর বিষয়বস্তু। তৎকালীন কলিকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের অনুকরণ করতে গিয়ে কীভাবে ধনীর দুলাল মতিলাল অধঃপাতের অতলে নেমে গেল, প্যারীচাঁদ তা-ই এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বাঙালি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ভালো-মন্দ চরিত্র ও কাহিনি নিয়ে প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থের কলেবর সমৃদ্ধ করেছেন। অথচ এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা এবং একে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। এর কারণও রয়েছে; বাবুরাম বাবু, মতিলাল, ঠকচাচা, রামলাল, বেচারাম বাবু প্রমুখ চরিত্রের সার্থক উপস্থাপন এবং একটি কাহিনিধারার সার্থক পরিণতির নিরিখে বিচার করলে এর উপন্যাস লক্ষণ অস্বীকার করা যায় না। প্রায় সে সময়কার ভবানীচরণের বাবু - কাহিনিগুলির মধ্যে যে কাহিনি বা চরিত্র ছিল তা একদিকে অপরিস্ফুট অন্যদিকে অসম্পূর্ণ। ঠিক তেমনি ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস দুটির কাহিনি নয় মৌলিক বা বাঙালির জীবনাশ্রিত নয়। এই সমস্ত কারণেই প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলালে'র দাবিই স্বীকৃত।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' / ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর রচনাকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (Historical Tales) নামে একটি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে আছে দুটি গল্প— 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। ইংরেজিতে 'রোমান্স অব হিস্টরি' নামে একটি গ্রন্থ আছে, সেটি থেকেই এই উপন্যাস দুটি রচিত। ওই গ্রন্থের প্রথা উপাখ্যান নিয়ে তৈরি হয়েছে 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি এবং দ্বিতীয় উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-ও তারই কিছু অংশ থেকে সংগৃহীত।

কন্‌টর সাহেবের যে 'রোমান্স অব হিস্টরি' থেকে অঙ্গুরীয় বিনিময় রচিত তার কাহিনি মোগল ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারার সঙ্গে মারাঠা বীর শিবাজির প্রণয় ও বিচ্ছেদের ঘটনাকে বর্ণনা করা হয়েছে। ভূদেব তাঁর উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র— শিবাজি, সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, জয়সিংহ, রোশেনারা, রামদাস স্বামী প্রমুখ প্রত্যেককেই ইতিহাসের পাতা থেকে গ্রহণ করেছেন। এঁদের মাঝে যে সম্বন্ধ-ঘটনা পরিচয় সবই ইতিহাস সম্মত। একটি কথা উল্লেখ করতে হয় যে, বাংলা উপন্যাস রচনার সেই প্রাক্-উষাকালে অধীত ইতিহাসবিদ্যা ও আপন সহজ ঔচিত্যবুদ্ধির সাহায্যে ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যে স্বল্প পরিমাণ হলেও কৃতিত্ব

দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু কাল্পনিক বিষয়ের প্রয়োগ করেছেন যাতে একদিকে ইতিহাস অন্যদিকে কল্পনা দুই মিলে এক সুন্দর সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছে। লেখক আপন কল্পনাশক্তির দৌলতে মোগলযুগের পটভূমিকায় শিবাজি-রোশেনারার আবেগতপ্ত মহৎ প্রেমের যে কাহিনি এঁকেছেন 'আঙ্গুরীয় বিনিময়ে'— সেখানে তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

ভূদেবের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে আট বছর পরে রচিত বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র কথা মনে পড়ে যায়। উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মনে করেন "আজ এই উপন্যাসখানির মূল্য তেমন হয়তো নাই, কিন্তু বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে ইহার অসীম মূল্য বলিয়া আমার ধারণা। দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) জগৎসিংহ ও আয়েষার প্রণয় কাহিনীর চিত্রমূল শিবাজী ও রোশেনারার প্রণয় কাহিনী।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে রচনাগুণে, বা সার্থক ঔপন্যাসিক লক্ষণ বিচার করলে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' হয়তো তেমন কিছু গ্রহণীয় পাওয়া যাবে না, কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে এটি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য রচনা।

'পালামৌ / সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমের সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর খ্যাতি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমাগ্রজের পরিচয়ে নয়, বরং বলা যায় তাঁর অবিস্মরণীয় ভ্রমণোপন্যাস 'পালামৌ'-এর জন্য। 'পালামৌ' প্রকাশ পায় 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৭-৮৯ সালে। অবশ্য তাঁর কিছু প্রবন্ধ এবং কিছু উপন্যাসও ('রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ১৮৭৭) 'কণ্ঠমালা ১৮৭৭; 'জাল প্রতাপচাঁদ ১৮৮৩; 'মাধবীলতা' ১৮৮৪ ইত্যাদি) রয়েছে, কিন্তু পালামৌ'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর মধ্যে প্রতিভার কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু নিতান্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাবে, তাঁর প্রতিভা প্রস্ফুটিত ও পরিণত হতে পারেনি। তবু বলতে হয়, ভ্রমণোপন্যাসটিতে তিনি যে কবিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন তা দুর্লভ। বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনি উপলক্ষে যে আখ্যান বাদ দিয়ে মনোরম সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়, সে ব্যাপারটি 'পালামৌ'-তে ধরা পড়ে। ছোটনাগপুরের আদিম-অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশু-মানব লেখকের সমবেদনা-রসধারার স্পর্শে 'পালামৌ'তে নতুনতর মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে জীবন্ত হয়েছে। তাই বলতে হয়, অসংলগ্ন ও অপ্রচুর চিত্রসমষ্টি হলেও 'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।

'পালামৌ' আজ ভ্রমণ বৃত্তান্তরূপেই পরিচিতি লাভ করেছে, আসলে এর মূল্য আরও বেশি— একে ভ্রমণোপ্যাস বলা যায়। প্রকৃতিবিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে এই গ্রন্থে মানবপ্রেমী সঞ্জীচন্দ্রের মিলন ঘটেছে। এই মিলন হয়েছে অত্যন্ত সহজ ও নিবিড় ভাবে। এ জন্যই রচনাটি হয়তো এত সার্থকতা লাভ করেছে। 'পালামৌ'-তে বন্য প্রকৃতির সঙ্গে বনের মানুষ একাকার হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সঞ্জীবচন্দ্রের বাইরে আর কেউ দিতে পারেননি। প্রতিভার তুলনায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি পর্যাপ্ত নয়। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা যদি যথার্থরূপে প্রস্ফুটিত হত, তবে বাংলা সাহিত্যের উচ্চ আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকতেন।

স্বর্ণলতা/তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমের সমসাময়িক হলেও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্কিমের প্রতিভার যখন দীপ্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন বাংলা উপন্যাস জগতে আবির্ভূত হন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে।

'স্বর্ণলতা' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ। তারকনাথ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুলাই সোমবার রাত আটটার সময় এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়েছে। তিনি আরও লেখেন যে, "Some Character of my novel are from the real life" তিনি বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্সগুলি, এমনকি 'বিষবৃক্ষে'র কাহিনিবস্তুকেও পছন্দ করেননি। কেননা, তাঁর ধারণা ছিল এর মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের জীবন ও যথার্থ মানুষগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের মধ্যেকার সেই অপ্রাপ্তিকে তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন তাঁর 'স্বর্ণলতা'র মধ্য দিয়ে, ফলে এই কাহিনিকে তিনি তথ্যবৎ করেন। এ ব্যাপারে তারকনাথ সে সময়ে প্রভূত প্রশংসা পেলেও গভীর প্রত্যয় বা তীব্র জীবন-জিজ্ঞাসা কোনো কিছুই এতে পাওয়া যায় না। এক অগভীর, পারিবারিক জীবনের অনাড়ম্বর কাহিনি হিসাবে স্বর্ণলতা সেদিন আমাদের আনন্দ দিয়েছিল— এটুকুই তার ঐতিহাসিক মূল্য।

তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামে গ্রামে ডাক্তারি করতে গিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি ও কিছু কিছু চরিত্রের সন্ধান পান। এগুলোকেই তিনি এই উপন্যাসে আঁকবার চেষ্টা করেন। এই উপন্যাসের কাহিনি বাঙালি পরিবারের সরল-সামাজিক চিত্র হলেও তারকনাথ এর বাঁধুনিতে শক্তির পরিচয় দেননি। এই কাহিনির দুটি ভাগ— প্রথম অংশ সরলার মৃত্যু পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অংশ তার পরবর্তী ঘটনা। এ দুই ঘটনার মধ্যে কোনো নিবিড় ঐক্য লক্ষ করা যায় না, একমাত্র দাসী শ্যামা ছাড়া সংযোজক কোনো চরিত্রই নেই। এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য লক্ষ্যটি অস্পষ্ট।

'স্বর্ণলতা' দেশি-বিদেশি কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং রসরাজ অমৃতলাল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে এর নাট্যরূপ দান করেন। ওই সালেই ২২ সেপ্টেম্বরে 'স্টার থিয়েটারে' এটি অভিনীত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত এবং ব্যথিক মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতিবোধ হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তারকনাথেরও চরিত্রে মানবতার প্রতি সহানুভূতিবোধের একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। ....তথাপিও, 'স্বর্ণলতা'র মধ্য দিয়া তারকানাথের বাস্তব জীবন-রূপায়ণ যতই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠুক না কেন, তাহা আদর্শবাদের স্পর্শ লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া আর্টের সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; সেই কারণেই প্রত্যক্ষ জীবনাচরণের নিখুঁত বর্ণনার অতিরিক্ত আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই ইহা উপন্যাসের যতদূর লক্ষ্য ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই, কেবল সেই পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে মাত্র।"

রমেশচন্দ্র দত্ত/মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ঃ

রমেশচন্দ্র দত্ত বোধহয় একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি বঙ্কিমের সমসাময়িক হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জোরে বাংলা উপন্যাস পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বঙ্কিমের মতোই

সরকারী উচ্চকর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করার কথা বলেন। ইতিহাসে সমধিক আসক্তি থাকার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে আবির্ভূত হবার আগে ইংরেজিতে নানা মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে তরুণ বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেন। আবার প্রবীণ বয়সে করেন নানা শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ। অথচ এই ব্যক্তি ঐতিহাসিক-সামাজিক মিলিয়ে মোট ছ'খানি বাংলা উপন্যাস লিখেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত নিজের উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন, সে অনুবাদ ইংরেজি-ভাষী সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়ও হয়। তাঁর ছ'খানি উপন্যাসের মধ্যে দুখানি ইতিহাসের পটে আঁকা রোমান্টিক কাহিনি। এ দুটি হল— 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) এবং 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭)। দুখানি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস হল— 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯). এবং বাকি দুখানি হল সামাজিক ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস— 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। উল্লিখিত প্রথম চারখানি উপন্যাসে মোগল-ইতিহাসের একশো বছরের চিত্র আঁকা হয়েছে বলে এদের এক সঙ্গে বলা হয় 'শতবর্ষ'।

'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' বাংলা সাহিত্যে একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর বিষয় হল শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান। মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তার সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। শিবাজি নায়ক এবং প্রতিনায়ক হচ্ছেন ঔরঙ্গজেব। উপন্যাসের মূল ঘটনা যুদ্ধকেন্দ্রিক হলেও পারিবারিক কাহিনি একেবারে উপেক্ষিত নয়। মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের গৌরবময় ইতিহাসের মধ্যে বিবিধ ঐতিহাসিক চরিত্রের অদ্ভুত বিকাশ ও পরিণাম তিনি নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপন করে, ইতিহাসের মূল সুরটিকেও একই সঙ্গে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'— এই দুই উপন্যাসেই লেখকের দেশাত্মবোধের নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বঙ্কিমের সঙ্গে তুলনায় রমেশচন্দ্রকেই বেশি শক্তিশালী মনে করেন।

মাধবীকঙ্কণ ঃ

রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাস বঙ্কিমোত্তর যুগের একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর রোমান্স। এটি রমেশবাবুর দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রকাশ কাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

মোগল যুগের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক পটভূমিকার কোনো ফাঁক রাখেননি; কিন্তু ইতিহাস এই উপন্যাসের অপ্রধান অঙ্গ। মূলত এটি পারিবরিক উপন্যাস। টেনিসনের Enoch Arden কবিতার ঘটনার আদর্শে 'মাধবীকঙ্কণে'-র কাহিনি পরিকল্পিত হয়েছে। ভারত-ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সঙ্গে ভাগ্য বিপর্যয়ের সূত্রে নায়কের জীবন অনিবার্যভাবে জড়িত হয়ে পড়লেও লেখক শুধু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের উপরই আপন মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেননি। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও বিরহ-মিলনের প্রতিও লেখকের সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ ইতিহাস এখানে এসেছে উপন্যাসেরই প্রয়োজনে; ইতিহাসের প্রয়োজনে উপন্যাস রচিত হয়নি।

আর এই কারণেই ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা প্রমাণের দায় লেখকের ছিল না। উপন্যাসে প্রযুক্ত অনেক ঘটনাই ইতিহাসের যুক্তি মেনে চলেনি, ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ভরে তাদের বিচার করা যায় না; কিন্তু রমেশচন্দ্র সচেতনভাবেই লিখেছেন ঐতিহাসিক পারিবারিক রোমান্স। তাই তাঁর মৌলিক সৃজনী-প্রতিভা ও কৃৎকৌশল-প্রযুক্তির গুণে কোনো ঘটনাই অবিশ্বাস্য, অতিরঞ্জিত বা বাহুল্য বলে মনে হয় না; ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নরেন্দ্রনাথ, শ্রীশ ও হেমলতাকে কেন্দ্র করে প্রেমের ত্রিভুজ সৃষ্টি করে আধুনিক জীবনের চিরন্তন সমস্যাকে কেন্দ্র করে 'আপন মনের মাধুরী মিশালে' যে চিত্রকে লেখক উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রাপ্ত প্রণয়চিত্র সাধারণত বিশেষত্বহীন বা অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট; কিন্তু রমেশচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসে অস্বাভাবিক অতিরেক বর্জন করেছেন। নায়িকা হেমলতার দুই নায়ক কেন্দ্রিক দোলাচলতার চিত্রও অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গেই প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীশের শান্ত চাঞ্চল্যহীন ভালোবাসার পায়ে হেম তার সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্যকেই অর্ঘ্য দিয়েছে; কিন্তু নরেন্দ্রর উচ্ছ্বসিত দুর্বার আবেগের টানে হেমের সমস্ত নীরব, স্ফুটনোন্মুখ প্রেম ভেসে গেছে। এদিক দিয়ে হেমলতা চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র 'অচলা' চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে সরসতা বজায় রেখেছেন; বর্জন করেছেন প্রেমের উপন্যাসের চিরাচরিত কৃত্রিম আড়ম্বর-উচ্ছ্বাস-ন্যাকামো; যদিও উপন্যাসের উপসংহারে হেমের সংলাপে অলংকারবাহুল্য এবং নীতিকথার অযথা প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেম কাহিনির শোকাবহ পরিণাম বর্ণনায় রমেশচন্দ্র অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের ঘনঘটা, রোমান্সের ঐশ্বর্য এবং পারিবারিক ঘটনার সংমিশ্রণে, স্নিগ্ধ বর্ণনাকে এক সূত্রে মিলিয়ে দিয়ে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্সে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ না হলেও প্রায় অনুরূপ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, এবং এজন্যই বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় রমেশচন্দ্র দত্ত একজন অবশ্য উচ্চারণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন।

২.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের আলোচনার মূল বক্তব্যকে আর একবার সংহত আকারে দেখে নেওয়া যাক।

আমরা দেখলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই উপন্যাসের শিল্পসম্মত পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। যদিও ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শ তিনি অনুসরণ করেছেন, তবু মৌলিক কল্পনা ও রচনাগুণেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি ঐতিহাসিক রোমান্স ও সামাজিক উপন্যাস দু ধরনের গ্রন্থই রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস মহাকাব্যিক বিস্তার সমৃদ্ধ। উপন্যাসগুলিতে শিল্পী বঙ্কিমের তুলনায় নীতিবাদী বঙ্কিমের ভূমিকা প্রবল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি উপন্যাসের শিল্পরূপের তুলনায় তত্ত্বালোচনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আধুনিক সমাজ জীবনাশ্রয়ী চোখের বালিতে নারী চরিত্রের জটিলতাই প্রধান অবলম্বন। গোরায় রয়েছে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি। চতুরঙ্গে এসে ঘটনা-বাহুল্য কমে গেল, চরিত্রের অন্তর্লোক উদঘাটনই প্রধান হয়ে উঠল। তাত্ত্বিকতা, মননপ্রাধান্য, ইঙ্গিত বাহুল্য,

কাব্যরীতির আমন্ত্রণ ইত্যাদি নানাবিধ আঙ্গিক বৈচিত্র্যের অনুশীলন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসগুলিতে করেছেন।

রবীন্দ্র যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের আলোচনায় দেখা গেল তাঁরা মূলত বঙ্কিমের দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হয়েছেন।

২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

মার্কস : ইনি কমিউনিজম বা সাম্যবাদের জনক। প্রথাগত শিক্ষায় ইস্তফা দিয়ে তিনি The Rhenish Gazette নামে একটি উদারপন্থী পত্রিকার সম্পাদক হন। এঙ্গেলস্ এর সহযোগে তিনি Manifesto of the Communist Party রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Das Capital তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস্ প্রকাশ করেন।

ফ্রয়েড : প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ, মানুষের স্নায়বিক ও মানসিক রোগ সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। মনসমীক্ষণ বিজ্ঞানের তিনি প্রবর্তক।

এমিল জোলা : বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক। তাঁর লিখিত নানান ড্রিঙ্ক প্রভৃতি উপন্যাস অতি জনপ্রিয়।

দস্তয়ভস্কি : বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক। ১৮৪৬ এ তাঁর প্রথম উপন্যাস পুওর পিপল প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি একবার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির অন্যতম।

ভারজিনিয়া উলফ : ইংরেজ মহিলা সাহিত্যিক। আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের নতুন ধারার প্রবর্তক। টু দ্য লাইটহাউস, দ্য ওয়েভস ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

হার্ডি : বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি। ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাইড, অ্যা পেয়ার অব ব্লু আইজ ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

স্কট : স্কটল্যাণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও কবি। Waverly Novels তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে The Lady of the Lake উৎকৃষ্ট। Rob Roy, Marmion ইত্যাদি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ওয়াল্ট হুইটম্যান : সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি। গদ্য কবিতা রচনার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেন। Leaves of Grass, Drum Taps ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

লর্ড লিটন : প্রসিদ্ধ ইংরেজ। তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যে কয়েকটি উপন্যাস প্রসিদ্ধ। Eugene Aram, The Last Days of pominel ইত্যাদি তাঁর সুবিখ্যাত রচনা।

২.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক পরিচয় দিন এবং সবগুলিকে সমভাবে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, বিচার করুন।

২। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পরবর্তী উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক পরিচয় দিন এবং পূর্ববর্তী রবীন্দ্র উপন্যাসগুলির তুলনায় এগুলির শিল্পগত বিশেষত্ব নির্দেশ করুন।

৩। বাংলা উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ কতখানি স্থান পেয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় দিন। এই মর্মে আলোচনা কেবল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস রচনায় যে পালাবদল হয়েছিল তার স্বরূপ কীরকম ছিল আলোচনা করুন।

৫। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসের স্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৬। বঙ্কিম-যুগের (১৮৬৭-৯৪) অন্যান্য মুখ্য ঔপন্যাসিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন এবং এঁদের কার উপর বঙ্কিমের প্রভাব কতখানি সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করুন।

৭। রবীন্দ্রানাথের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিচার করুন।

৮। বঙ্কিম পূর্ব বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

৯। টীকা লিখুন ঃ

আলালের ঘরের দুলাল, দুর্গেশনন্দিনী, নৌকাডুবি, রমেশচন্দ্র দত্ত, পালামৌ, চার-ইয়ারি কথা, মাধবীকঙ্কণ, দেবী চৌধুরাণী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারীদেবী।

২.৯ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ — ৪ দ্রষ্টব্য।

****

তৃতীয় বিভাগ
উপন্যাস— রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-পরবর্তী

বিষয় বিন্যাস

৩.০ ভূমিকা (Introduction)
৩.১ উদ্দেশ্য (Objective)
৩.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩.৩ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী
৩.৩.১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩.৩.২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩.৩.৩ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৩.৪ রবীন্দ্র-পরবর্তী অন্যান্য ঔপন্যাসিক
৩.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা
৩.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৩.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৩.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৩.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

বাংলার রেনেসাঁসের, নবযুগের মোহনায় দাঁড়িয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের সূত্রে বাংলা কথা সাহিত্যের জন্ম সম্ভাবনা সূচিত হল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস মুক্তি পেল, সার্থক শিল্পিত উপন্যাসের জন্ম হল। তবে এর আগে ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদ-ভূদেব-কৃষ্ণকমল প্রমুখের হাত ধরে বাংলা উপন্যাসের জন্মসম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। তবে ভবানী-প্যারীচাঁদের সমাজচেতনা ব্যঙ্গের পথ ধরায় তাঁদের হাতে জীবনের গাঢ় সমগ্রতা অবহেলিত হল, সমাজ বাস্তবতার পথে বাংলা উপন্যাসের বিকাশ বাধা পেল। কারণ ব্যঙ্গ প্রাধান্য উপন্যাসের একটি গৌণ বৈচিত্র্য মাত্র হতে পারে, মুখ্য ধারা হয়ে ওঠে না কখনও। আসলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে একদিকে গদ্য-নকশা, অন্যদিকে প্রহসনের প্রাচুর্য ভবানী-প্যারীচাঁদের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা আত্মসাৎ করে নিল। আবার ইতিহাসে কল্পনায় মিশিয়ে যে গল্প-ভূদেব-কৃষ্ণকমল লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগরের কাহিনির সঙ্গে তার একদিকে খানিকটা সাজুয্য ছিল। কিন্তু অনির্দেশ্য পৌরাণিককাল থেকে নির্দিষ্ট ইতিহাসের অতীতে গল্পকে নামিয়ে আনলেন ভূদেব-কৃষ্ণকমল। কল্পনা তাতে অবাধ রইল কিন্তু বিশ্বাস্য হল। এঁরা পুরাতন নরনারীতে আধুনিক মানবসত্য আবিষ্কার করলেন। এভাবেই বঙ্কিমের ভূমিকা তৈরি হল। কিন্তু ভূদেব-কৃষ্ণকমল থেকে বঙ্কিমের ব্যবধান অনেক। তাঁদের নিশ্চিত অনুসরণ বঙ্কিমে নেই, কারণ আধুনিক জীবন বাস্তবতা ও সমাজ বাস্তবতার দাবি তাঁকে পীড়িত করেছিল। নবজাগরণের ফলস্বরূপ প্রবৃত্তিমুখী মানবচিত্তকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে তাই আঙ্গিক, বিষয় এবং ভাষা এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই সংস্কার সাধনের প্রয়াসী হলেন বঙ্কিম। রোমাঞ্চ ইতিহাসের অতীত ধূসরতা

এবং বাস্তব জীবন সমস্যার মর্ম-বেদনা তাঁর উপন্যাসে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। রবীন্দ্র পূর্ব যুগের বাংলা উপন্যাসের বঙ্কিম ধারা প্রবাহিত হলেও রবীন্দ্রনাথের এসে বাংলা উপন্যাসের একটা বিবর্তন দেখা গেল। চরিত্রের আঁতের কথা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াসী হলেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী শরৎচন্দ্রে এসে বাংলা উপন্যাস ব্যাপক জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে সমর্থ হল। শরৎচন্দ্র নারীমনের অন্তর্বেদনা, সংস্কারগত-দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সমস্যাগুলিতে প্রকটিত করে তুললেন। শরৎ পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধ—মন্বন্তর—গণ-আন্দোলন সবকিছু মিলে মানুষের চিন্তা-ধারা ও জীবন শৈলীর আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। মানুষ সবকিছুকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করলেন। সাহিত্য-সমাজ-জীবন সবকিছুর মধ্যেই দেখা গেল একটা বিদ্রোহ মনোভাব। সেই উত্তাল সময়ের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি ও নতুন নতুন চিন্তা-ধারা ধরা পড়েছে সেই সময়ের উপন্যাস ও ছোটোগল্পে। বিশেষ করে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল নবীন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে (বিশেষ করে কথাসাহিত্য) নতুন জোয়াড় নিয়ে এসেছেন। সেই নবচেতনার জোয়াড় স্বাধীনতাত্তোর বাংলা সাহিত্যেও বিশেষভাবে অব্যাহত রয়েছে। এখন আমরা শরৎচন্দ্র থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বংলা উপন্যাসের ধারাকে আলোচনা করব।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objective)

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস একটি আধুনিক আঙ্গিক। উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-জীবনে যখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হল তখনই বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব হল এবং আজও সেই উপন্যাস রচনা অব্যহত রয়েছে। রবীন্দ্র পরবর্তী উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ১৯৭২ পর্যন্ত উপন্যাসের বিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করব। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের রচনা কর্মের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা অনুসন্ধান করব তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের কারণসমূহ, বিভিন্ন কালপর্বে বাংলা উপন্যাসে যে বিশিষ্ট শিল্প লক্ষণ ধরা পড়েছে— সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

৩.২ শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি যেমন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর অনুজ লেখক গোষ্ঠীর উপর বেশ কিছুটা প্রভাবও তিনি বিস্তার করেছিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তিনি নিজের মানস প্রবণতা অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানও করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পগঠন রীতি পদ্ধতি শরৎচন্দ্র অনুসরণ করলেও বঙ্কিমের রোমান্সপ্রবণতা ঘটনা বাহুল্য ও অতিলৌকিকতা শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই সমস্ত উপাদানের জায়গায় তিনি নিয়ে এসেছিলেন বিশ্লেষণ প্রাধান্য, জীবনের নিত্যনৈমিত্যিক ঘটনাবলি কেন্দ্রিক মানব চরিত্রাঙ্কন। ভাবাবেগের প্রাধান্য ও ভাষা তাঁর রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নীতিবোধের দিক থেকে সামাজিক রক্ষণশীলতায় পিষ্ট ও দলিত মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। বঙ্কিমের সমাজদৃষ্টি তাঁর কাছে নীতিবাগীশতা রূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

আবেগের অতিরেক তাঁর সমস্ত রচনার এক উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভাষারীতি এবং বর্ণনাভঙ্গিও উচ্ছ্বাসবহুল। তিনি জীবনকে মূলত ভাবাবেগের আতিশয্যের মধ্য দিয়ে দেখেছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি মূলত পারিবারিক জীবনের কথাকার, তাঁর উপন্যাসের সমাজ জিজ্ঞাসার মধ্যেও পরিবার জীবনের চিত্র কাহিনির কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। সমকালের সংসারী বাঙালি নরনারী, শিশুকিশোরের জীবন ও বাংলার পল্লিসমাজ তাঁর রচনায় চিত্রিত হয়েছে।

সমাজ-সংস্কার ও নীতিবোধ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা। বাংলা দেশের গ্রামজীবনের নানা অত্যাচার-অনাচার, সমাজপতিদের অন্যায় স্বার্থপরতা, জমিদারের অত্যাচার ও শোষণ এবং সাধারণ মানুষের হীনমন্যতাকে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ধিকৃত করেছেন। নরনারীর বিবাহকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিধবা নারীর প্রেমের কাহিনিতে তাঁর শিল্পী চিত্তের এক বিশেষ প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিবাহিত নারীর অন্তরেও অপরের প্রতি আকর্ষণের সুতীব্র চিত্র এঁকেছেন। হৃদয়বেদনায় আন্দোলিত মানুষের অতৃপ্ত বাসনার আর্তধ্বনিই তাঁর শিল্পীপ্রাণ কান পেতে শুনেছে। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। এই নারীচরিত্রগুলি সৃষ্টিতে তিনি এক বিশেষ প্যাটার্নের অনুসারী হয়েছেন। বাঙালি নারীর পরিবার জীবনের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত মূর্তিকেই তিনি পূজা করেছেন। নারীর প্রতি অবহেলা লাঞ্ছনা ইত্যাদির কথা তাঁর উপন্যাসে উচ্চারিত হলেও বাঙালি সংসারের নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসাবে নারীকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। প্রেয়সীর অন্তরেও তিনি কল্যাণী জননীকে আবিষ্কার করেছেন। তাই নারীর নিরঙ্কুশ প্রেয়সী মূর্তি নয়, কল্যাণী মাতৃভাবনাই তাঁর রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য 'গৃহদাহের'র অচলা এবং 'দেনাপাওনা'র-ষোড়শী এর ব্যতিক্রম। তাঁর অধিকাংশ নারীচরিত্রগুলি যেন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী। এই নারী একদিকে প্রেমের আকুলতায় সমাজ নীতিকে আঘাত করে, সন্তানস্নেহে আকুল হয়, পার্থিব জীবনের প্রাত্যহিকতাকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে, অন্যদিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যায় নিত্য উপবাস, ব্রত— ভোগের উপকরণ থেকে আত্মবঞ্চনার বিচিত্র সাধনা। এই সাধনায় কিন্তু এর প্রভাব সর্বব্যাপী। এক সুতীব্র অভিমান ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নারী আপন ব্যক্তিত্বে ভাস্বর।

তাঁর সৃষ্ট প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলির ভিত্তিতেও প্যাটার্নের প্রতি আনুগত্য লক্ষ করা যায়। পরনির্ভরশীলতা, ঔদাসীন্য এবং স্নেহবুভুক্ষা তাঁর অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রে কমবেশি প্রযুক্ত হয়েছে। কাহিনিতে পুরুষের পৌরুষ-কাঠিন্য প্রতিষ্ঠার উপর তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেননি।

পল্লিগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে পল্লিগ্রামের পটভূমিকা ব্যবহৃত হয়েছে। পল্লির মানুষ তাঁর উপন্যাসে প্রধানত দুটি স্বতন্ত্র টাইপ হিসাবে ধরা পড়েছে। এই দুই দলের এক দল পরশ্রীকাতর, কূটবুদ্ধি, স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা। এদের বিপরীতে অপর দল প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম নাগরবৈদগ্ধ্য-বর্জিত, সরল হৃদয় ও উদার চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাসে নিছক পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শিক্ষানবিশির নানা চিহ্ন এগুলিতে বর্তমান। উপন্যাসগুলি আকারে প্রকারেও ক্ষুদ্র।

সামাজিক বা নীতিগত প্রশ্ন এগুলিতে উত্থাপিত হয়নি। কোনো বিরাট আবেগ বা হাহাকারও ধরা পড়েনি। এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে আছে— 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪); 'পরিণীতা' (১৯১৪); 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪); 'মেজদিদি' (১৯১৫); 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬); 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬); 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬); 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭)। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে একমাত্র পল্লীসমাজেই উপন্যাসের পূর্ণলক্ষণ আছে। এই উপন্যাসেই লেখকের স্পষ্টনীতি বিরুদ্ধতা প্রথম দেখা গেল। সমাজবিরোধী প্রেম এবং তাঁর মীমাংসা 'পল্লীসমাজে'র মুখ্য বিষয়। বাকি কাহিনিগুলি অনুত্তেজক পারিবারিক জীবনের আখ্যান হলেও এগুলি লেখকের সহানুভূতির রসে সিঞ্চিত। বাস্তব পটভূমিকার জন্য এর একটা সার্বজনীন আকর্ষণও আছে।

এই জীবনরসের কাহিনিগুলি ছাড়াও তিনি সমাজ ও নীতিঘটিত কিছু উপন্যাস রচনা করেন। এবং সেগুলির উপরই মূলত তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতি নির্ভরশীল। এই উপন্যাসগুলির জন্যই তিনি একদা নীতিবাগীশ সমালোচক কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন, আবার প্রগতিবাদী নতুনের দল তাঁর মধ্যে এমিল জোলা, ওয়াল্ট হুইটম্যান, দস্তয়ভ্স্কি প্রমুখের প্রতিফলন লক্ষ করে তাঁকে প্রশংসিত করেছিলেন। তাঁর এই ধরনের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব ১৯১৭, ২য় ১৯১৮, ৩য় পর্ব ১৯২৭, ৪র্থ পর্ব- ১৯৩৩), 'বড়দিদি' (১৯১৩); 'বিরাজ বউ' (১৯১৪); 'দেবদাস' (১৯১৭); 'চরিত্রহীন' (১৯১৭); 'দত্তা' (১৯১৮); 'গৃহদাহ' (১৯২০); 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০); 'দেনাপাওনা' (১৯২৩); 'নববিধান' (১৯২৪) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলির আখ্যান আকারে কিছু বড়ো, ঘটনার জটিলতা এবং চরিত্রের বিকাশে উপন্যাস পদবাচ্য। এই পর্বে শরৎচন্দ্র মানবজীবনের গভীর ও জটিল সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এগুলির কাহিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। শরৎচন্দ্র এই পর্বে অধিকাংশ উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজের তথাকথিত চরিত্রনীতি, সতীত্ব, সংযম প্রভৃতি আদর্শকে ধূলিসাৎ করে সমাজের অনাচর-অবিচারের ভারে পীড়িত সাধারণ মানব-মানবীর মর্মন্তুদ কাহিনি রচনা করে সমাজের শিষ্ট ও শিক্ষিত স্তরে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলেন। তাঁর এ পর্বের উপন্যাসগুলিতে হৃদয়ধর্মের সঙ্গে সমাজনীতির সংঘর্ষের আলেখ্য রচিত হয়েছে। সমাজ ও চরিত্রনীতির চাপে কত নরনারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেই বিনাশ ও ব্যর্থতার বেদনামধুর ছবি এঁকে তিনি যুগোপযোগী এক প্রকার নব্য মানবতাবাদের রসরূপ সৃষ্টি করেছেন। রচনাগত ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভাবাতিশয্য সত্ত্বেও রচয়িতার দৃষ্টিকোণের এই বিশিষ্টতা উপন্যাসগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি চারখণ্ডে বিভক্ত, অনেকের মতে এটিই শরৎচন্দ্রে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের রচনারীতিতে তিনি এক অভিনব আঙ্গিকের সূচনা করতে চেয়েছেন, উপন্যাসটি ভ্রমণ কাহিনির রীতিতে রচিত। 'শ্রীকান্ত' নামক কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে জীবনের বিচিত্র ঘটনা এবং নানা জাতীয় মানুষ এতে ভিড় করে এসেছে। এর অধিকাংশ চরিত্রই সুচিত্রিত। শ্রীকান্তর ভবঘুরে প্রকৃতি, প্রেমপ্রীতি সহানুভূতি, আসক্তি-নিরাসক্তির আলোছায়ায় চরিত্রটি অনবদ্য রূপময়তা লাভ করেছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা, সুনন্দা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'দত্তা' উপন্যাসটি রোমান্টিক কমেডি। জীবনের গভীর বেদনা এতে প্রকাশিত

হয়নি। তবে শরৎচন্দ্রের গল্পকথন নৈপুণ্যের জন্য রচনাটি স্বাদু ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'পরিণীতা'ও প্রায় সমগোত্রীয় উপন্যাস।

'শরৎচন্দ্রের নীতিবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশক হিসাবে 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাস দুটি উল্লেখযোগ্য। 'চরিত্রহীনে' বিধবা সাবিত্রীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কিরণময়ীর ব্যর্থ জীবনের যন্ত্রণা এবং আত্ম-অবক্ষয়ের ট্র্যাজেডিও সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। তবে উপন্যাসের পরিণামে উপেন্দ্রর আদর্শবাদই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে। চরিত্রহীনের কাহিনি শিথিলবদ্ধ, তুলনায় 'গৃহদাহ' সংহত ও একাগ্র। এর আঙ্গিক সবরকম বাহুল্য বর্জন করে এক মার্জিত কাঠিন্য লাভ করেছে। এই উপন্যাসে নায়িকা অচলার দ্বিধা-দীর্ণ হৃদয়ের ট্র্যাজেডি লেখকের সহানুভূতি-রসে মণ্ডিত হয়ে চিত্রিত হয়েছে। গম্ভীর, স্থিতধী মহিম এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ, প্রাণচঞ্চল সুরেশের মধ্যে অচলার নারীচিত্ত অন্তহীনভাবে দোলায়িত হয়েছে। এই আন্দোলন অচলাকে সতত যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। ভাবাতিরেক থাকলেও 'গৃহদাহ' একটি শক্তিশালী উপন্যাস।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'পথের দাবী' উপন্যাসটি শরৎ-উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসধারায় এটি এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। উপন্যাস-শিল্পের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা না পেলেও পথের দাবী উল্লেখ্য রাজনৈতিক ভূমিকার দিক থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মতো গভীর তাৎপর্যবহ না হলেও 'পথের দাবী' ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বর্ধিত করেছিল। এই উপন্যাসের রাজনৈতিক ভাবনা আবেগপ্রধান এবং অপরিণত মনে হলে এর অন্তর্গত বৈপ্লবিক উত্তেজনা এবং গোপন রাজনীতির রোমাঞ্চকরতা সেকালের বাঙালি তরুণদের আকৃষ্ট ও উদ্দীপিত করেছিল।

'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫), এবং 'শেষের পরিচয়' (অসম্পূর্ণ)— শরৎচন্দ্রের শেষজীবনে লিখিত এই উপন্যাসগুলিতে কিছু নতুন লক্ষণ ধরা পড়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যের নবীন জীবনজিজ্ঞাসা এগুলোতে ছায়াপাত করেছে। ভাবের আতিশয্য সত্ত্বেও কিছু মননশীলতা, সংলাপের ভাষায় বুদ্ধির কিছু দীপ্তি এপর্বে প্রকাশিত। নরনারীর বিবাহের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং বড়ো কোনো বন্ধন এবং সম্বন্ধের সন্ধানে তিনি এই উপন্যাস তিনটিতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই উপন্যাস তিনটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'শেষ প্রশ্ন'। কমলের চরিত্রদীপ্তি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে উপন্যাসটিতে তর্ক-বিতর্ক, মতামতের আক্রমণ ও উগ্রতা চরিত্রের স্বাভাবিক জীবন্ত রূপকে বহুলাংশে বিনষ্ট করেছে। পরিশেষে বলা যায়, বিরাট বিশাল ও মহৎ কিছু সৃষ্টি করা শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল না। তিনি সামান্যর মধ্যে অসামান্যকে আবিষ্কার করেছেন, অঙ্গারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন প্রচ্ছন্ন বহ্নিকণাকে। সমাজ ও নীতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বা কোনো জটিল মীমাংসা তিনি করেননি— তাঁর কাজও তা নয়, তাঁর কাজ মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, বাস্তব কাহিনিকে অবলম্বন করে অপূর্ব শিল্পরস পরিবেশন করা। সেদিক থেকে তিনি যথার্থ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য একান্তভাবে বাঙালি জীবন কেন্দ্রিক হয়েও বহুক্ষেত্রেই ভূগোল-ইতিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে চিরকালের মানুষের শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছে। এখানেই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য; আর এখানেই তাঁর সাফল্য।

৩.৩ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী

উপন্যাস কথাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ, উপন্যাস তাকেই ধরতে চায় সমগ্র করে। মানুষের পরিচয় ততক্ষণই আংশিক বা অসম্পূর্ণ, যতক্ষণ তার সময় ও পরিসর-প্রতিবেশের সঙ্গে সে অন্বিত নয়। সার্থক উপন্যাস, মানুষকে তার সময় ও পরিসরের সুবিস্তৃত পটে স্থাপন করে নানা কৌণিক অবস্থান থেকে আলো ফেলে তার উপর; এভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যক্তির প্রাতিস্বিক পরিচয়, আর তার সঙ্গে উঠে আসে তার সামাজিক অভিজ্ঞান, বহতা সময়ের পটছবি। আধুনিক উপন্যাস ব্যক্তির চেতন-অবচেতনের দ্বান্দ্বিকতা যেমন প্রত্যক্ষ করে, তেমনি তা, ধরে রাখে সভ্যতার উত্থান-পতনের বিচিত্র কূটাভাস। ফলে এই সৃষ্টি কেবল ঘটনা-পরম্পরার সংগ্রন্থনেই সীমাবদ্ধ না থেকে, পৌঁছে যায় সত্তার গভীরতম প্রদেশে, বাখ্‌তিন কথিত কার্নিভাল চেতনার সূত্রে যে অস্তিত্ব সুদূর, অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাকে অদৃশ্য অথচ অলংঘ্য সুতোয়। তাই উপন্যাস কোনো মীমাংসা নয়, উপন্যাস প্রশ্নের বিস্তার; আখ্যানের ভেতরে থাকে আরো এক আখ্যান বা পরা আখ্যান। গ্রন্থিসৃজন ও গ্রন্থি মোচনের দ্বিবাচনিকতায় এ এক সমগ্র শিল্প। অথচ, উপন্যাসের এই বহুমাত্রিত তাৎপর্য বোধকরি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ করে ধরতে পারেননি, তাই একজনের কাছে ঘটনার গ্রন্থি আর অপরজনের কাছে চরিত্রের আঁতের কথা টেনে বের করে দেখানোই বড়ো হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে 'এনটিটি'-র মৌলিক প্রশ্নটি যখন তিরিশের দশকে নানা জটিলতার আবর্তে পড়ল তখনই উপন্যাসের পাঠকৃতির ভেতরে বহুমাত্রিক তাৎপর্য সন্ধান অনিবার্য হয়ে উঠল। আধুনিক জীবনপ্রত্যয়ে বাংলা উপন্যাস উত্তীর্ণ হয়েছে তিরিশ ও উত্তর তিরিশের যে কয়জন কথাকারের হাত ধরে, তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণ-বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিক তিন স্রষ্টা তাঁদের অন্যতম।

৩.৩.১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়সের দিক থেকে বিভূতিভূষণই (১৮৯৪-১৯৫০) তিনজনের মধ্যে প্রবীণতর। প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ এ, শেষ রচনা 'ইছামতী' ১৯৪৯-এ। এই বিশ বছরের মধ্যে একে একে বেরিয়েছে 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'দেবযান', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'কেদার রাজা' ইত্যাদি উপন্যাস। বিভূতিভূষণ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী কথাকার। 'যান্ত্রিক সভ্যতার জটিলতা', রুক্ষ কঠোর জীবনসংগ্রাম কিম্বা মানবতার নির্মম ক্ষয়-থিম হিসাবে এসব তিনি গ্রহণ করেননি— অথচ এইসব নিয়ে উদ্বেগ তাঁর লেখায় অনুপস্থিত নয়। শরৎচন্দ্রীয় গার্হস্থ্যরসের স্বাদ তাঁর লেখায় পাওয়া গেলেও, প্রকৃতির প্রতি একাত্মতার যে গভীর অনুভব, প্রকৃতি ও মানবের অকৃত্রিম সম্পর্কের যে অভিজ্ঞান তাঁর লেখায় রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। প্রকৃতি মানুষের পরম স্নেহের নিবিড় আশ্রয়, প্রকৃতিই মানব শিশুর দৃষ্টিকে বিকশিত করে। সব কিছু ভঙ্গুর হলেও প্রকৃতির তো বিনাশ নেই। আত্মজৈবনিক স্থাপত্যে গড়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনারই অনুপম উপলব্ধি। অপূর চোখের বিস্ময়, আরণ্যকের সত্যচরণের বিস্ময় ও ইতিহাসবোধ; প্রৌঢ় ভবানী বাঁড়ুয্যের (ইছামতী) অধ্যাত্মদৃষ্টি, সেই পরম 'ঈশ' এর উপলব্ধি-এতো বিভূতিভূষণেরই অনুভূতির

তিনটি স্তর, মুগ্ধতা ও বিস্ময় শেষে সাধক ভবানীতে রয়েছে প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ। দুঃখদরিদ্রের ছবি তিনি এঁকেছেন, সামাজিক নির্যাতন তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে, নারীর স্বাতন্ত্র্যসন্ধান ভবানীর জবানিতে কথাকারের প্রসন্ন স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার মুনাফার প্রয়োজনে জঙ্গলমহাল ধ্বংস করতে গিয়ে সত্যচরণ যে ব্যথায় ব্যথিত হয়, তা তো কথাকারেরই যন্ত্রণা। তাঁর হরিহর যাত্রা পাঁচালি কথকতার সূত্রে বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করে, আর নিস্তারিনী পৌঁছে যায় সত্তরের দশকের নারীবাদী আন্দোলনের ইস্যুতে। আবার 'দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে'র খুঁটিনাটি বর্ণনায় তিনি গ্রহণ করেন জয়েসীয় বিবৃতি রীতি, অথচ, রূপকথার স্বপ্নমাধুরীতে ভুলে থাকেন না কভু। আক্ষরিক অর্থেই তাঁর উপন্যাসগুলি Open ended, পাঠক আপন মূল্যবোধের সঙ্গে যথাপ্রাপ্তের দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে প্রতিবেদনের অন্য অর্থ বের করে নিতে পারেন। আকরণোত্তরবাদীর চোখে তাই বিভূতিভূষণ যথার্থ অর্থেই, তাঁর প্রকৃতি-মানুষ ঈশ্বরের জগৎ নিয়ে একান্তই আধুনিক।

৩.৩.২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। নিরাসক্ত বিবৃতির দুর্লভ গুণটি অনায়াসেই যেন অধিগম্য হয়েছিল তাঁর। রাঢ় দেশের রোদতপ্ত দুপুরের মতো একটা ঔদাসীন্য তাঁর লেখায় রয়েছে। পটে ধরা জীবন নয়, পটকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন এই কথাকার। হার্ডির মতো আঞ্চলিক জীবনচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেও অঞ্চলকে অতিক্রম করে পৌঁছে যান এক গুরুতর আর্থসামাজিক প্রশ্নে। আকর্ষণজীবী ও কর্ষণজীবী, নবোত্থিত পুঁজিবাদ-সংস্কৃতি ও প্রাচীন সামন্তীয় সংস্কারের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের সূত্রে কীভাবে গ্রাম সমাজের অস্তিত্বের মর্ম ধরে নাড়া দিচ্ছে, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে পুরোনো মূল্যবোধ; সামাজিক সম্পর্ক সব— ক্রান্তিকালের এই সংকটাপন্ন ছবিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর। 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৪৩), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫৩), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), ইত্যাদি উপন্যাসের নাট্যরস জমে উঠেছে দুই মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে। দ্বারিকা চৌধুরী কিম্বা জীবন মশায়ের চোখের সামনে অনিরুদ্ধ-প্রদ্যোত শ্রীহরি ঘোষ-দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ন্যায়রত্নর পুত্র শিখেছে গোপনে ইংরেজি আর পৌত্র প্রকাশ্যে খ্রিস্টানদের সঙ্গে টেবিলে বসে আহার করছে। বনোয়ারী-দ্বারিজা-জীবন মশায়ের সামাজিক প্রতিপত্তি থাকছে না, করালীরা কারখানার শ্রমিক হয়ে পূর্বতন বিশ্বাস সংস্কার ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করছে। গ্রাম থেকে শহরে উঠে যাচ্ছে সভ্যতা ও প্রতাপের কেন্দ্র। এই বিবর্তনের নিরাসক্ত চিত্রের পাশাপাশি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তারাশঙ্কর চিত্রিত করেছেন নিম্নবর্গীয় জীবনের ছবি। বাউল-বৈষ্ণব-ঝুমুর-কবিয়াল মিলিয়ে লোকজীবনের ও সংস্কৃতির এক গতিশীল পরিচয় দান করতে গিয়ে কোথাও আতিশয্য আসেনি, লাগেনি রোমান্টিকতার রঙ। 'কীর্তিহাটের কড়চা', 'কবি' কিম্বা 'চৈতালী ঘূর্ণীর' কথাকার নাট্যকারের মতোই নিজেকে আড়াল করে রাখেন অথচ উত্তম পুরুষে মোপাসাঁর গল্পের নৈর্ব্যক্তিক 'আমার' কণ্ঠেই কথকতার সুরে জীবনের উত্থান পতনের বিচিত্র কাহিনি বলে

যান। সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু সবকিছু খড়কুটোর মতো ভেসে চলে কোপাই-ময়ূরাক্ষীর জলস্রোতে, তবু মৃত্যুঞ্জয় প্রেম ইন্দ্রিয়সংরাগ-পাপ ও প্রতাপ, পতন ও উত্তরণ— তাঁর উপন্যাসের অগণিত চরিত্রমালা ধরে রাখে জীবনের এই সব কাহিনি। যেন ধরে রাখে না, সময়ের পটে, স্রোতের আবর্তনে এগুলি কেবল ভেসে ওঠে ফেনার মতো। এই নৈর্ব্যক্তিকতা; বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুপুঙ্খ বিবৃতির রীতিই তারাশঙ্করকে করে তুলেছে যথার্থ অর্থেই যুগন্ধর। বাবু অবাবুর দ্বন্দ্বে তারাশঙ্করের শ্রেণিচরিত্র-জ্ঞান কথাকারের সমাজ সচেতনতা ও বিষয়বোধের গভীরতাকেই চিহ্নিত করে। 'অরণ্যবহ্নি' 'কবি', 'রাধা'-র পাঠক অবশ্যই জানেন, নগর জীবনের অস্থির বর্ণজটিলতা কিম্বা ইতিহাসপট নয়, তারাশঙ্করের স্বক্ষেত্র ভারতবর্ষের পরিবর্তমান ইতিহাস তাঁর উপন্যাসে অঞ্চল বিশেষের দর্পণে ধরা পড়েছে গোটা ভারতভূমি। তারাশঙ্কর বিন্দুতে সিন্ধুকে ধরে দেওয়া মহাকবি এক।

৩.৩.৩ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯১০-১৯৫৬) ভূমিকা কেবল স্রষ্টার নয়, আন্দোলিত এক ইণ্টারপ্রেটরের। বিশ শতকের সমান বয়সী তিনি, যুদ্ধে বিপ্লবে তিনিও বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখেছেন। নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের শিকলপরা সীমাবদ্ধতা তাঁকে ব্যথিত করেছে, ফ্রয়েডের মনোবিকলনবাদ প্রভাবিত করেছে চিন্তাচেতনা আর মার্কসবাদে তিনি খুঁজে পেয়েছেন উত্তরণের সংকেত। সবমিলিয়ে তাই তাঁর লেখায় জটিলতা বেশি। 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫); 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৪০), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৯), 'অহিংসা' (১৯৪৮), 'শহরতলী' (১৯৪০), 'চিহ্ন' (১৯৪০) ইত্যাদি তাঁর প্রধান উপন্যাস। 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর অভিনব গঠনশৈলী নিয়ে ব্যাতিক্রমী পথে যাত্রারম্ভ মানিকের। প্রেম তাঁর এই উপন্যাসের অবলম্বন বলে ভাষা কাব্যধর্মী, নিজেও এটাকে 'রূপক কাহিনী' বলে চরিত্রগুলিকে বলেছেন মানুষের Projection। ফ্রয়েডের তত্ত্বের আলোয় চেতন অবচেতনের জটিল দ্বান্দ্বিকতা ও আদিম প্রবৃত্তির টানকে উপন্যাসের জীবনসন্ধানী অর্থ-তাৎপর্যে ধরতে চেয়েছেন কথাকার। 'জননী', 'জীবনের জটিলতা'' পেরিয়ে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় মনোবিকলনবাদের সঙ্গে যুক্ত হল প্রখর সময়বোধ, এই উপন্যাসটিকে সার্থক করে তুলেছে সামাজিক নিয়তির ক্রূর হাসি। কালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে পীড়িত নায়ক শশী শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ, উত্তরণ সম্ভব হয় না, কে বা 'কোন এক বোধ' যেন নাচায় তাকে। শহরতলিতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের এক রূপ আর 'পদ্মানদীর মাঝি'তে গরীবের মাঝে গরীব, ছোটোলোকের মাঝে ছোটোলোকের অন্তহীন লড়াইয়ের ছবি। আধিপত্যশালী বর্গের হাতে বারবার লাঞ্ছিত হয়েছে কুবের, পদ্মা আর হোসেন মিলে যেন অন্ধনিয়তির মতো দুর্বার দুরতিক্রম্য এক শক্তি হয়ে উঠেছে। মানিক চমকে দেন লখা-চণ্ডীর মারামারিতে নিস্পৃহ বাপ কুবেরের চিত্তবিকার দেখিয়ে, যখন শীতলবাবুর সঙ্গে কপিলার কথাবার্তা তাকে অধীর করে। বারবার পরাজয় মানুষকে নিষ্ঠুর নির্মম করে দিলেও দেহমনের আকাঙ্ক্ষা তো শেষ হয় না, পরাজয়ের মুখে শোনা যায় অমোঘ উচ্চারণ, জীবনের জয়ঘোষণা — 'আমারে নিবা মাঝি লগে?" আঞ্চলিক উপন্যাস লিখেও অঞ্চল নিরপেক্ষ মানুষের জীবনকথাই শোনান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ উত্তরণের একটা বলিষ্ঠ পথরেখা এঁকেছেন তাঁর শেষের দিকের রচনায়। অনুপুঙ্খতা,

বাস্তবতা, কার্নিভাল চেতনা ও ক্রনোটোপিয়ান সমগ্রতা— সব মিলিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক শক্তিশালী কথাকার; কথায় যিনি প্রতীক নির্মাণ করেন—দ্বন্দ্বের প্রতীক— মানিক সেই শক্তিমান স্রষ্টা।

তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, আঙ্গিকে, আঞ্চলিক বাস্তবতা চিত্রণে কিছুটা মিলও লক্ষ করা যায়। একথা ঠিক যে সমরেশ-মহাশ্বেতা থেকে আবুল-বাশার বাণী বসু পর্যন্ত উপন্যাস অনেকখানি এগিয়েছে, কিন্তু চিন্তায় মননে ও সৃষ্টিশৈলীতে বাংলা উপন্যাসে আলোচ্য তিন ঔপন্যাসিকই আধুনিকতার প্রাণসঞ্চার করেছেন।

৩.৪ রবীন্দ্র-সমকালীন ও রবীন্দ্র -পরবর্তী অন্যান্য ঔপন্যাসিক

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রবীন্দ্র পরবর্তী সব উপন্যাসিকই কম-বেশি পরিমাণে ছোটোগল্পের লেখক। শরৎচন্দ্র ও তিন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক) মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত হলেও তাঁরা প্রচুর ছোটোগল্প রচনা করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্র-পরবর্তী যেসব কথাসাহিত্যিক ছোটোগল্পকার হিসেবে বেশি জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁরাও উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দেশভাগ-গণ-আন্দোলন, মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, নানা ভাব ও বিষয়বস্তু রবীন্দ্র পরবর্তী লেখকদের গল্প উপন্যাসে শৈল্পিক মহিমায় ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা ভাব ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের রচনায় প্রকাশ্যেই রবীন্দ্র-বিরোধীতা ভাব দেখা গেল।

রবীন্দ্র-সমকালীন বিখ্যাত ছোটোগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। যেমন - 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'জীবনের মূল্য' (১৯১৭), 'সিন্দুর কৌটা' (১৯১৯), 'মনের মানুষ' (১৯২২), 'আরতি' (১৯২৪), 'সত্যবালা' (১৯২৫), 'সুখের মিলন' (১৯২৭), 'সতীর পতি' (১৯২৮), 'প্রতিমা' (১৯২৯), 'বিদায়বাণী' (১৯৩৩), 'গরীব স্বামী' (১৯৩৮), 'নবদুর্গা' (১৯৮৮), ইত্যাদি।

জীবনের সহজ-সরল আবেদন ও নির্মল দৃষ্টি-ভঙ্গিই প্রভাতকুমারের উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমের মতো তাঁর উপন্যাসে কাহিনির প্রাধান্য ও কল্পনার বিচিত্রতা লক্ষ করা যায় না, কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর উপন্যাসে গভীর কোনো প্রত্যয়ের ইঙ্গিত নেই। আবার শরৎচন্দ্রের সুগভীর মানবিকতা ও ভাবাবেগের অশ্রুসজল করুণরসও প্রধান হয়ে উঠেনি তাঁর উপন্যাসে। বলা যায়, হাস্য - কৌতুকরসের সহজ-সরল আবেদন উদার মানবিক ভঙ্গিতে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উপন্যাসকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

রবীন্দ্র-ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কথাশিল্পী জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) নৈরাশ্যবাদী লেখক হিসেবে বিখ্যাত। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক ও নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হয়ে উঠেছে। মানবজীবনের ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতার আড়ালে যে এক ক্রুর রহস্যময় ইঙ্গিত কাজ করছে সে সম্পর্কে লেখক সচেতন ছিলেন এবং তাঁর উপন্যাসে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হ'ল - 'লঘু গুরু', 'অসাধু সিদ্ধার্থ', রতি ও বিরতি', 'গতিহারা জাহ্নবী', 'দুলালের দোলা', 'রোমন্থন', 'অতল সৈকতে' ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমবয়েসী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) সমসাময়িক ঔপন্যাসিকের থেকে স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হ'ল - 'বিষের ধোঁয়া' (১৩৫১), 'ছায়া পথিক' (১৩৫৬), 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৩৫৮), 'ঝিদের বন্দী', 'গৌড়মল্লার' (১৩৬১), 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৩৭২), 'কালের মন্দিরা' (১৩৫৮), ইত্যাদি। বিচিত্র বিষয়-সমৃদ্ধ তাঁর উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিতে অতীত জীবনযাত্রার পুনর্গঠন ও কল্পনা প্রধান হয়ে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮৭) বাংলা সাহিত্যে স্বপ্ন-বেদনাভরা রোমান্টিক উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর উপন্যাসগুলি নাম - 'নীলাঙ্গুরীয়' (১৯৪৫), 'নয়ান বৌ' (১৯৬১), 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' (তিন খণ্ডে প্রকাশিত) ইত্যাদি।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অন্যতম কথাশিল্পী বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) প্রায় অর্ধশত উপন্যাসের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হ'ল - 'তৃণখণ্ড' (১৯৩৫), 'বৈতরণীর তীরে' (১৯৩৬), 'কিছুক্ষণ' (১৯৩৭), 'সে ও আমি' (১৯৪৩), 'অগ্নি' (১৯৪৬), 'দ্বৈরথ' (১৯৩৭), 'মৃগয়া' (১৯৪১), 'নির্মোক' (১৯৪০), 'ডানা' (তিনখণ্ডে প্রকাশিত - ১৯৪৮-১৯৫৫) ইত্যাদি আরও। লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা, উদ্ভবনী শক্তি ও প্রকরণ বৈচিত্র্যে উপন্যাসগুলি অসাধারণ মর্যাদা লাভ করেছে। লেখকের পেশাগত ডাক্তারি জীবনের বিচিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সম্প্রদায়-প্রাদেশিকতা নির্বিশেষে সংকীর্ণতা মুক্ত মনোভাব ও মানবিকতাবোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজাগতা, নৈতিকতাবোধ— এ সমস্ত কিছুই লেখকের শৈল্পিক স্পর্শে অসাধারণ মাত্রা লাভ করেছে।

'কালি কলম' (১৩৩৩-১৩৩৬) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৫) কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি 'ঝড়ো হাওয়া' (১৩৩০), 'বাংলার মেয়ে' (১৩৩২), 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (১৩৩৩), 'খরস্রোতা' (১৩৩৯), 'রূপবতী' (১৩৪০), 'উদয়াস্ত' (১৩৪১), 'হোমানল' (১৩৪২), 'কাঁকনতলার মেয়ে' (১৩৪২), ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রধানত কয়লা কুঠির কুলি-মজুর-সাঁওতালদের দৈনন্দির জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, প্রণয় সংঘাত, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে। তিনিই উপন্যাসে সর্বপ্রথম কয়লাকুঠি মানুষদের জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

কল্লোলযুগের বিশিষ্ট লেখক মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)। বিষয় বৈচিত্র্যে, রচনার দ্রুত পারম্পর্যে ও চরিত্র্যের স্বাতন্ত্র্যে তাঁর উপন্যাসগুলি উজ্জ্বল। প্রকৃতির নিবিড় রোমান্টিক ভাবনা তাঁর উপন্যাসে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির নাম- 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), 'বৃষ্টি, বৃষ্টি' (১৯৫৭), 'আমার ফাঁসি হ'ল' (১৯৫৯), 'রক্তর বদলে রক্ত' (১৯৫৯), 'মানুষ গড়ার কারিগর' (১৯৫৯), 'রূপবতী' (১৯৬০), 'বন কেটে বসত' (১৯৬১), ইত্যাদি।

রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভ করা শান্তিনিকেতনের স্বনামধন্য ছাত্র প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাস রচনা ক্ষেত্রেও প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত ত্রয়ী উপন্যাস— 'পদ্মা' (১৯৩৫),

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৭/৩৮), এবং 'কোপবতী' (১৯৪১)। আঞ্চলিক উপাদান নিয়ে রচিত এই উপন্যাসগুলিতে লেখক কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় মাধ্যমে নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় তুলে ধরেছেন।

কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) এক স্বতন্ত্র শিল্প প্রতিভা নিয়ে বাংলা উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর উপন্যাস- গুলি হ'ল - 'বেদে', 'আকস্মিক', 'কাকজ্যোৎস্না', 'প্রচ্ছদপট', 'ঊর্ননাভ', 'আসমুদ্র' ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাসে তিনি জীবনকে রোমান্টিকতার মোহমাখানো দৃষ্টিতে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কাব্যেচ্ছ্বাসের আবেশে তাঁর উপন্যাস এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

কল্লোল ভাবধারার বিখ্যাত লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) তাঁর 'সূর্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাসে অভিনব পটভূমিকায় রোমান্সরসের আমদানি করেছেন। অন্যদিকে, দরিদ্র জীবনের দৈনন্দিন জীবন শৈলীর গ্লানি ও কদর্য রূপ চিত্রিত হয়েছে তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসে।

কল্লোলের প্রতিবাদী মানসিকতায় বর্ধিত কথাসাহিত্যিক প্রাবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩) পোড়খাওয়া সাধারণ মানুষদের আবেগ উদ্দীপনাময় সুখ-দুঃখের জীবনচিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি 'যাযাবর' (১৯২৮), 'দুই আর দুয়ে চার' (১৯৩১), 'বাতাস দিল দোল' (১৯৩১), 'কাজললতা' (১৯৩১), 'কলরব' (১৯৩২), 'প্রিয়বান্ধবী' (১৯৩৩), 'আলো আর আগুন' (১৯৩৭), 'আঁকাবাঁকা' (১৯৩৮), 'নদ ও নদী' (১৯৪০) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন।

কল্লোলযুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) মূলত কবি হলেও উপন্যাস রচনায়ও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিন উপন্যাস গুলি হ'ল - 'অকর্মণ্য' (১৯৩১), 'রডোডেন-ড্রনগুচ্ছ' (১৯৩২), 'সানন্দা' (১৯৩৩), 'ধূসর গোধূলি' (১৯৩৩), 'যেদিন ফুটলো কমল' (১৯৩৩), 'ধূসর গোধূলি' (১৯৩৩), 'অসূর্যস্পশ্যা' (১৯৩৩), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৯৩৪), 'বাসরঘর' (১৯৩৫), 'পরিক্রমা' (১৯৩৮), 'কালো হাওয়া' (১৯৪২), ইত্যাদি। মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নিঃসঙ্গতার আড়ালে আত্মবিস্মৃত অন্তর্গূঢ় আত্মার অবগুণ্ঠন মোচনের প্রয়াস বুদ্ধদেবের উপন্যাসের মূলকথা।

বহু প্রতিভার অধিকারী মেধাগুণসম্পন্ন প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) উপন্যাস রচনায়ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে চিরাচরিত চেনাকালকে সামগ্রিক রূপে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হ'ল - 'অসমাপিকা' (১৯৩০), 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩), 'সত্যাসত্য' (ছয়খণ্ডে প্রকাশিত - ১৯৩২-৪২), 'ক্রান্তদর্শী', 'বিশল্যকরণী', 'তৃষ্ণার জল' ইত্যাদি।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) হলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখক। সমকালীন পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশাভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা— রাজনীতি এই সমস্ত কিছুকে নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে মানুষের মনোগহনের জটিল অন্ধকার গুহার চোরা গলিতে তীব্র আলো ফেলার সন্ধানী দৃষ্টি। তাঁর উপন্যাসগুলি হ'ল - 'জাগরী' (১৯৫০), 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১ম খণ্ড- ১৩৫৬, দ্বিতীয় খণ্ড - ১৩৫৮), 'অচিন রাগিনী' (১৯৫৪), 'সংকট' (১৯৫৭), এবং 'দিগভ্রান্ত' (১৯৬৬)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক তথা জনপ্রিয় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বেশ কিছু উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তারাশঙ্কর যেমন তাঁর উপন্যাসে রাঢ়ভূমির জীবন-চিত্র তুলে ধরেছেন, তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে বারেন্দ্রভূমির জীবনচিত্রের রূপ দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস গুলি হ'ল - 'উপনিবেশ', 'মাদ্রমুখর', 'স্বর্ণসীতা', 'সূর্যসারথী', 'বিদিশা', 'শিলালিপি', 'লালমাটি', 'মহানন্দা', 'পদসঞ্চার', 'অসিধারা', 'মেঘরাগ', 'নিশি-যাপন', 'ভস্মপুতুল', 'সন্ধ্যার সুর', 'পাতাল কন্যা', 'নির্জন শিখর', 'তৃতীয় নয়ন' ইত্যাদি আরও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী এমন আরও শক্তিশালী ঔপন্যাসিক রয়েছেন যাঁরা সত্তর দশক এবং তারপরেও বহু উপন্যাস ও ছোটোগল্প লিখে গেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৭), সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৪), বিলম কর (১৯২১-২০০৩), রামপদ চৌধুরী (১৯২২—), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখ।

এঁদের প্রত্যেকের রচনায় সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ-জীবন ও যুগযন্ত্রণার বাস্তব চিত্র গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

৩.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা

কল্লোল যুগের কথাসাহিত্য ঃ কল্লোল যুগের সূচনা বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। প্রচলিত সাহিত্যের বহতা ধারায় একটা বড়ো আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়াস এবং বহমান গতিকে ভিন্নমুখী করার উদ্যম গ্রহণ করেছিলেন কল্লোলীয়রা। বন্ধন-বেদনা থেকে মুক্তির দুর্মর রোমাণ্টিক তৃষ্ণা এঁদের ছিল, যদিও ছিল না স্পষ্ট নতুন কোনো জীবনপ্রত্যয়। এই দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা এই যুগের তরুণ মানসের যন্ত্রণার অন্যতম উৎস। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সকল লেখক সাহিত্যে রবীন্দ্র-উত্তর যুগ প্রবর্তনের সংকল্প করেছিলেন তারাই কল্লোলগোষ্ঠী বলে পরিচিত।

১। কল্লোলের সাধনা নবীনতার। যেমনটি আছে সেটাই ঠিক — এর অস্বীকৃতি।

২। ধর্ম, প্রেম ও নীতি সম্পর্কে আদর্শবাদী চিন্তাধারার অভাব। এক ধরনের সংশয়ী ও নাস্তিক্যবুদ্ধির উদ্ভব।

৩। কথাসাহিত্যে বিষয়-সীমার প্রসার ও বৈচিত্র্য, উপকরণের প্রতুলতা।

৪। বস্তুনিষ্ঠা বা Realism-এর দিকে ঝোঁক, যৌন-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ, নিম্নমধ্যবিত্তের দুঃখবোধের প্রকাশ। কিন্তু এই বাস্তবতা একপেশে। নিরাসক্ত হতে গিয়ে জীবনের কদর্য দিকের চিত্র।

৫। প্রচলিত প্রথাকে ভাঙা, যৌন মনস্তত্ত্বের অসঙ্কোচ রূপায়ণ, অনিকেত বোহেমিয়ান জীবন— এই সবই রোমাণ্টিক উদ্দামতার পরিচায়ক। তাঁদের আবেগ ছিল মধ্যবিত্তসুলভ।

৬। গণতান্ত্রিক চেতনা ধরা পড়েছে সাহিত্যে, এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা।

৭। এ যুগের অন্যতম সাহিত্যিক লক্ষণ নগরচেতনা, চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত চরিত্রের রূপায়ণ।

৮। মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য, বর্ণনা ধর্মিতা কম।

৯। সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।

১০। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা, অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে বক্তব্য বিষয়ের দুরূহতা।

['কল্লোল যুগ' সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য বর্তমান পত্রের অন্তর্গত অধ্যায়— ১এর সংক্ষিপ্ত টীকা দ্রষ্টব্য।]

'আরণ্যক' ঃ

'আরণ্যক' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের এক নিগূঢ় অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে— যা বাংলা সাহিত্যে অভিনব ব্যাপার। এই উপন্যাসে লেখক বিহারের লবটুলিয়া আজমাবাদ ফুলকি— বইহার প্রভৃতি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও জীবনযাত্রার আলেখ্য রচনা করেছেন। 'আরন্যক' শুধু প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণনার উপন্যাস নয়, এই উপন্যাসে সাধারণ ভূমিলগ্ন দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার নিষ্করুণ জীবন-সংগ্রামের চিত্রও বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসে যেন সত্যিকারের ভারতবর্ষ তার অপরূপ বৈচিত্র্য, অনন্ত বিস্ময়ে উজ্জ্বল প্রাণ-মহিমায় বিধৃত হয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি অরণ্যের মতোই সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও জীবনরসে ভরপুর।

গণদেবতা ঃ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, 'গণদেবতা' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথমে 'চণ্ডীমণ্ডল' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ কালে লেখক এর নাম দেন 'গণদেবতা'।

'গণদেবতা' উপন্যাসে রাঢ়ের জীবনযাপন প্রণালী, মানুষের মূল্যবোধ, পর্বান্তরের সূচনা— সব কিছুই সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' - এই উপন্যাস ট্রিলজির মধ্যে 'গণদেবতাই' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গ্রাম্য মানুষদের দারিদ্র্য, তাদের সুখ-দুঃখময় লোকায়ত জীবনের নানা উৎসব-পার্বন, লৌকিক আচার-আচরণ-প্রথা সংস্কৃতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক ভাবনার পটভূমিতে গ্রাম-জীবনের রীতি-নীতি সংস্কার প্রবণতা অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রভৃতি এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে আধুনিক যন্ত্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রামরত ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম বাংলার একটি জীবন্ত বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন।

পুতুলনাচের ইতিকথা ঃ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ

উপন্যাস। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত লেখদের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাস থেকেই শুরু হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের স্বরূপ। এই উপন্যাসে বহু চরিত্রের অন্তর্লৌকিক জটিলতাকে গ্রামীণ পটভূমিকার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন এবং গাওদিয়া গ্রামের জীবনের জটিল সমস্যাপূর্ণ চিত্র রয়েছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের প্রধান সমস্যা 'শশীর মনের সমস্যা, তার সত্তার মূলীভূত সমস্যাই এই উপন্যাসের বিষয়— গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার সূত্রে শশীর জীবনের বিড়ম্বনার জট পাকিয়ে যাওয়ার সমস্যা'। জীবনের অপার জটিলতা, অসংগতি এবং দুজ্ঞেয় রহস্যর শক্তির ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। লক্ষণীয় বিষয়— প্রেম যে ভাববাদী কোনো কল্পবস্তু নয়, তা সমস্তই 'দেহের রহস্যে বাঁধা' একথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। এই উপাখ্যানটি উপন্যাসে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

জাগরী ঃ

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ১৯৫৫খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। এটি সতীনাথের প্রথম রচনা এবং এর জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রাজনীতি করতে গিয়ে সতীনাথ ১৯৪০-১৯৪৪ পর্যন্ত তিন তিনবার কারাবরণ করেন এবং এই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে ১৯৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিকায় 'জাগরী' উপন্যাস রচনা করেন। গান্ধীর অহিংসাবাদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে র‍্যাডিক্যাল মনোভাব ও মার্কসীয় দর্শন-মিশিয়ে লেখক এই উপন্যাসের ভিত্তি তৈরি করেছেন। তাই এই উপন্যাসকে অনেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'কারা উপন্যাস', কেউবা 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের চারজন চরিত্র— মা, বাবা, নীলু ও বিলু; এদের স্মৃতিপটে সমস্ত গত কাহিনি এবং তৎ-আনুষঙ্গিক চরিত্রগুলি বর্ণিত হয়েছে। এই চারজন চরিত্রের মানসিক চিন্তা বৈপরীত্যের পটভূমিকায় সতীনাথ এক অসাধারণ কাহিনি বয়ন করে শিল্প-মাধুর্যের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।

৩.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

শরৎচন্দ্র বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। আবেগবহুল পারিবারিক জীবন চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। নারীর মনুষ্যত্ব এবং সামাজিক সংস্কারের দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপযোগ্য।

তারাশঙ্কর—বিভূতিভূষণ—মানিক— এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্নতর পথানুসন্ধান করেছেন উপন্যাসে। একটা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কনে তারাশঙ্করের উপন্যাস মহাকাব্যিক বিশালতা লাভ করেছে, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান অবলম্বন, আর বিভূতিভূষণের শিল্পীসত্তা মুক্তি খুঁজে পেয়েছে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে, উদার পরিমণ্ডলে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে

ফুটে উঠেছে সমকালীন রাষ্ট্রীয় জীবনের বাস্তব চিত্র। নানা সমস্যা, দ্বন্দ্ব, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেইসব উপন্যাসে।

৩.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ-১ দ্রষ্টব্য।

৩.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। বিংশ শতাব্দীর নাগরিক জীবন-চিত্র পরিহার করে গ্রাম-বাংলার আচার-সংস্কার, পুরোনো বিশ্বাস ও সংরক্ষণশীল মনোভাব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়ে একটা আলোচনা প্রস্তুত করুন।

২। কল্লোলগোষ্ঠী কী এবং এই গোষ্ঠীর প্রভাব আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোথায় কোথায় ফলপ্রসূ হয়েছে দেখান।

৩। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির তুলনা করে বাংলা উপন্যাসে তাঁদের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট দানের দিকটি স্পষ্ট করুন।

৪। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক বিবরণ দিন।

৫। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকবর্গের আবির্ভাবের তাৎপর্য এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মের সামান্য বিশেষত্ব আলোচনা করুন।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায় এয়ী বাংলা উপন্যাস জগতে যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তা আলোচনা করুন।

৭। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৮। **টীকা লিখুন ঃ**

কয়লাকুঠি, অন্তঃশীলা, পথের দাবী, পথের পাঁচালি, আরণ্যক, পুতুলনাচের ইতিকথা, গণদেবতা, জাগরী।

৩.৮ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ — ৪ দ্রষ্টব্য।

****

চতুর্থ বিভাগ
বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)
৪.১ উদ্দেশ্য (Objective)
৪.২ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প
৪.৩ রবীন্দ্র-সমকালীন ও রবীন্দ্র-পরবর্তী গল্পকার
৪.৩.১ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৪.৩.২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪.৩.৩ পরশুরাম
৪.৩.৪ জগদীশ গুপ্ত
৪.৩.৫ বনফুল
৪.৪ সংক্ষিপ্ত টীকা
৪.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৪.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৪.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৪.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

ছোটোগল্প এমন একটি শিল্প-আঙ্গিক যার উৎপত্তি আধুনিক যুগে। অবশ্য প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর নানা ভাষায় নীতি, ধর্ম, রোমান্স প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে। আমাদের দেশেও সংস্কৃত এবং প্রাদেশিক ভাষাতেও অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক ছোটোগল্প তা থেকে স্বতন্ত্র— এ এক নতুন ধরনের শিল্প। গল্পের আয়তনের উপর ছোটোগল্প নির্ভরশীল নয়। ছোটোগল্প মূলত লেখকের ব্যক্তি হৃদয়ের বিশেষ মানসবৈশিষ্ট্যে রঞ্জিত একটি মন্ময় রচনা। এদিক থেকে ছোটোগল্প অনেকাংশে গীতিকাব্যিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ছোটোগল্প বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ এনে দেয়, লেখকের এক ক্ষুদ্র কিন্তু গভীর অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনের এক পরম বিস্ময়ের ঘনীভূত রসসত্তা আত্মপ্রকাশ করে; পরিলক্ষিত হয় খণ্ডের মধ্যে সামগ্রিকতার দ্যোতনা।

পাশ্চাত্য সমালোচক ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন— "A Short story must contain one and only one informing idea and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method" ছোটোগল্প আখ্যানসর্বস্ব নয়, সংহত পরিধিতে বাহুল্য বর্জিত ভাবে মানুষের জীবন সম্বন্ধে কোনো একটি কেন্দ্রীয় ব্যাপারের ওপর আলোক নিক্ষেপ করাই হল ছোটোগল্পের প্রধান লক্ষণ। নাটকীয়তা, গীতিমূর্ছনা, আকস্মিকতা ও ব্যঞ্জনা ছোটোগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমরা ছোটোগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছি। এবারে আমরা ছোটোগল্পের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের আলোচনাসহ রবীন্দ্র- সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্পের বিষয়ে আলোকপাত করব।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objective)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শেষতম শ্রেষ্ঠ আঙ্গিক বাংলা ছোটোগল্প। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশের ধারা পথেই বাংলা ছোটোগল্পের আবির্ভাব। বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সার্থকতম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্প আরও নতুন নতুন ভাব-আঙ্গিক-বিষয়বস্তু নিয়ে দিগন্ত বিস্তৃতি রূপ লাভ করেছে। দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্র-পরবর্তী যে সমস্ত ঔপন্যাসিক রয়েছেন তাঁরা কমবেশি পরিমানে ছোটোগল্পেরও লেখক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকদের পরিচয় দিয়েছি তাঁদের মধ্যে অনেকে ছোটোগল্প রচনায় সমান দক্ষতার সাক্ষর রেখেছেন। তবে এই বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ছোটোগল্পকার হিসেবে যাঁরা বেশ জনপ্রিয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোটোগল্প রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাঁদের নিয়েই আলোচনা করব। অবশ্য এই গল্পকারেরা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের দাবিদার।

৪.২ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প

বাংলাদেশে গল্প আখ্যান প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথই ছেটোগল্পকে যথার্থরূপে জীবন দান করেন। তিনিই এর পথনির্মাতা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর হাতেই রচিত হয়েছিল যথার্থ বাংলা ছোটোগল্প। প্রধানত সাময়িক পত্র-পত্রিকার তাগিদে তাঁর গল্প লেখা শুরু হয়। তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'ভিখারিনী' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এটি গল্প রচনার প্রথম প্রয়াস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ নিজে এটিকে যথোচিত ছোটোগল্পের মর্যাদা না দেওয়ায় এটি গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। রবীন্দ্র ছোটোগল্পের সূচনা পর্বের অন্য দুটি গল্প যথাক্রমে ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলি গল্পগুচ্ছের তিনটি খণ্ডে এবং তিনসঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলিকে কালানুক্রম ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম পর্ব (১৮৯১-১৯০১)— হিতবাদী-সাধনার যুগ।
দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৪-১৯৩০)— ভারতী-সবুজ পত্রের যুগ।
তৃতীয় পর্ব (১৯০৩-১৯৪০)— তিনসঙ্গীর যুগ।

সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক রূপে যোগ দিয়ে প্রতি সংখ্যার জন্য একটি করে ছোটোগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু নানা কারণে এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ইত্য বসরে পদ্মাতীরে জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা করার উপলক্ষে তিনি বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে পরিচিত হলেন, বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখ দুঃখের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। দ্বন্দ্ব-কলহ, ত্যাগ-ভোগ, নীচতা-

স্বার্থপরতা, স্নেহ-ভালোবাসা প্রভৃতির সংমিশ্রণে পল্লি-বাংলার যে জীবন গড়ে উঠেছে, তাকে গল্পের মাধ্যমে ধরতে চাইলেন তিনি। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় তাঁর ছোটোগল্প সম্পর্কিত মনোভাবটি চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়েও হইল না শেষ।"

এই মনোভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বহু ছোটোগল্প রচনা করেন, যার অনেকগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্বে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের মধ্যে কঙ্কাল, অতিথি, ত্যাগ, একরাত্রি, ক্ষুধিত পাষাণ, পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, বিচারক, নিশীথে, মণিহারা ইত্যাদি গল্প অন্যতম। এই পর্বের বেশিরভাগ গল্পই পদ্মাতীরে লিখিত। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কারের ফলে গল্পগুলি সরস ও প্রাণরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাধারণ গ্রামজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এগুলিতে রূপলাভ করেছে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ কবিচিত্তের প্রীতির রসে জারিত হয়ে এই গল্পগুলির জন্ম দিয়েছে।

১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র'কে অবলম্বন করে তাঁর ছোটোগল্পের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ। হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, পয়লা নম্বর, অপরিচিতা, বোষ্টুমী ইত্যাদি এই পর্বের অসামান্য রচনা। এই পর্বের গল্পগুলিতে নাগরিক বাচনভঙ্গি এবং ভাবকল্পনার বিশিষ্টতা প্রকাশিত। নাগরিক চাতুর্য এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্যের নৈপুণ্যে, তির্যকতায় এই গল্পগুলি চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। এই পর্বের গল্পগুলি কিছুটা প্রচারধর্মী, এগুলিতে ব্যক্তিত্ব বনাম পারিবারিক মর্যাদা ও সামাজিকতা তীব্র দ্বান্দ্বিকতার সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তির আত্ম-উন্মোচন এবং স্বাতন্ত্র্য এগুলিতে লক্ষণীয়।

১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'তিনসঙ্গী' রবীন্দ্র গল্পের তৃতীয় পর্বের পরিচয়বাহী। এছাড়াও লিপিকার বেশিরভাগ লেখা, 'সে এবং গল্পসল্প' গ্রন্থে ছোটোগল্পের নানাবিধ পরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পর্বের রচনাভঙ্গির তির্যকতা এবং ভাব চেতনার আধুনিকতা তথা তত্ত্বপ্রাধান্য উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছে। নারীপুরুষ সম্পর্কের নব রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনায় সুস্পষ্ট। পুরুষের সৃষ্টিকার্যে নারী-স্বভাবের অনির্বচনীয় মাধুর্যকে তিনি এই পর্বে বিশেষ মূল্য দান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে পরিবার জীবনের চিত্র স্থান পেয়েছে। সমাজ-সমস্যার কথাও এসেছে। তবে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মানসমুক্তি, তাই দেনাপাওনা, দান-প্রতিদান ইত্যাদি গল্পে তিনি ততটুকু স্বচ্ছন্দ নন। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, স্বর্ণমৃগ ইত্যাদি গল্পে বাস্তব জীবনসমস্যার মধ্যেও সামান্য উপকরণে গভীর

আলোড়ন এনেছে। সাংসারিক বিচারে অসার্থক মানুষের হৃদয়বত্তার ছবি ব্যবধান, রাসমণির ছেলে ইত্যাদি গল্পে ফুটে উঠেছে। নষ্টনীড় গল্পে সমাজসমস্যা অগ্নিদাহের তীব্রতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অসামাজিক প্রেমের এই গল্পে কবি আধুনিকতম বিদ্রোহী মনোভাবকে রূপায়িত করেছেন। সবুজপত্র যুগের গল্পগুলিতে ব্যক্তিসত্তাকে সমাজবন্ধন থেকে মুক্ত করার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, তবে একটু প্রচারের সুর এগুলির শিল্প সৌন্দর্যের পক্ষে কিঞ্চিৎ হানিকর হয়েছে। স্ত্রীর পত্র গল্পে নারীর সামাজিক মূল্যের সোচ্চার ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। হৈমন্তী, অসাধারণ প্রভৃতি গল্পেও নারীর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব চিত্রিত।

যে সমস্ত গল্পে পারিবারিক হৃদয় সম্বন্ধকে গৃহসীমা থেকে মুক্তি দিয়ে নিখিলের বিস্তৃতিতে স্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে তিনি শিল্পসাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেছেন। কাবুলিওয়ালা গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বহুক্ষেত্রে প্রকৃতিকেও ব্যবহার করেছেন কবি। পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি প্রভৃতি গল্প এই জাতীয়। প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে কতকগুলি গল্পে। ছুটি গল্পের ফটিকের মুক্তির বাসনা অতিথির তারাপদর চরিত্রে আরো গভীর হয়ে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনার মূল ভিত্তিকে প্রকাশ করেছে। তবে ফটিকের তুলনায় তারাপদ চরিত্রে গভীরতা বেশি, প্রকৃতির মূল শক্তি— আশ্চর্য নিরাসক্তি তার মধ্যে রূপলাভ করেছে। সুভা গল্পের বোবা মেয়েটি ভাষাহীন প্রকৃতির সঙ্গে যেন একাত্ম। এই সম্বন্ধের সূক্ষ্মতা ভাষার অনির্বচনীয় কলানিপুণতায় প্রকাশিত।

মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, দুরাশা প্রভৃতি গল্পে রোমান্সরস সৃষ্টিতে কবির সাফল্য প্রশ্নাতীত। প্রথম তিনটি গল্পে অতিপ্রাকৃত রস রোমান্সের উপকরণ জুগিয়েছে। তবে এই অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে ভৌতিকভাবের সম্পর্ক নেই। মানবচিত্তের স্বপ্নের কল্পনা বা পাপবোধ এবং স্পর্শকাতরতা সত্য ও মায়ার বিভ্রম রচনা করে অতিপ্রাকৃত রস ঘনীভূত করে তুলেছে।

সমস্যাপূরণ, কঙ্কাল, শাস্তি, মহামায়া ইত্যাদি গল্পগুলি চরিত্রপ্রধান। শাস্তি গল্পে দুই নারীর জটিল চরিত্রে ঘৃণা-তৃষ্ণার লীলাবিলাসকেই রূপদান করেছেন কবি। সমস্যাপূরণে স্খলিত চরিত্র সরকার মহাশয়ের ব্যক্তিমহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কঙ্কাল গল্পে রূপ-মোহ-প্রবৃত্তি-ঈর্ষা ইত্যাদি একটি চরিত্রকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। মহামায়ার রমণী চরিত্রের বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে তার সূক্ষ্ম আত্মসম্মানবোধের মধ্যে।

'তিনসঙ্গী'র গল্প তিনটিতে (রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি) আধুনিক জীবনের নানা ব্যক্তিগত সমস্যার অতবারণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন, 'প্রথম গল্প রবিবার একটি মনোরম প্রেমকাহিনি, দ্বিতীয়টি আরণ্যক জৈবতার মতো অন্ধ আকর্ষণ থেকে অবিচার পুনরুদ্বোধন এবং নবীনমাধবের অনিচ্ছালব্ধ মুক্তি (শেষ কথা) এবং তৃতীয়টিতে সোহিনী নামে এক জ্যোতির্ময়ীর প্রলোভনের অগ্নিচক্র রচনা করে নন্দকিশোরের বিজ্ঞানযজ্ঞের ঋত্বিককে বিফল সন্ধান (ল্যাবরেটরি)।'

পঞ্চাশ বৎসরে ৮৫টি গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ছোটোগল্পের প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধি তাঁরই হাতে। জগৎ ও জীবনের নানা সমস্যা, অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। চরিত্রের বিবর্তন, নাটকীয় সমাপ্তি, অতিপ্রাকৃত উপাদানকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাজে প্রয়োগ, প্রকৃতির উন্মুক্ত পটভূমিকায় মানবমনের বিশ্লেষণ,

বিশিষ্ট রচনারীতি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ধারা প্রচলিত করেছিলেন তিনি, তারই অনুশীলনের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী গল্পকারেরা রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪.৩ রবীন্দ্র-সমকালীন ও রবীন্দ্র-পরবর্তী গল্পকার

বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সার্থকতম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে বাংলা ছোটোগল্পে আরও নতুন নতুন ভাব ও বিষয়বস্তু স্থান লাভ করেছে। এমনকি আঙ্গিকগত বিবর্তনও আমাদের চোখে পড়ে। এখন রবীন্দ্র-সমকালীন ও পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংলা ছোটোগল্পকারদের নিয়ে আলোচনা করব।

৪.৩.১ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন চারটি— 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭), 'মুক্তামালা' (১৯০১), 'মজার গল্প'(১৯০৪) এবং 'ডমরুচরিত' (১৯২৩)। তিনি রবীন্দ্র যুগের সূচনাকালে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। চারটি সংকলনের মোট গল্প সংখ্যা ত্রিশ, রবীন্দ্রযুগের সূচনাকালে গল্প রচনা আরম্ভ করলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি।

ত্রৈলোক্যনাথের চারটি গল্প সংকলনই মূলত গল্প-মালা, এগুলিতে রয়েছে গল্পের মধ্যে গল্প, অথবা এক গল্পের টানে অপরাপর গল্প। তিনি গল্প রচনায় কোনো আধুনিক আদর্শ অনুসরণ করেননি। জাতক বা পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি বা বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, চসারের ক্যাণ্টারবারি টেল বা ঈশপের গল্পমালার অনুসৃতিই তাঁর গল্পে লক্ষণীয়, তাঁর গল্পে উদ্ভট, আজগুবি, অলৌকিক ও রূপকথার উপাদানের বাহুল্য আছে। অবশ্য যুক্তিধর্মিতা, পরার্থপরতা, দেশহিতৈষিতা ও মানবমুখিতার পরিচয়ও তাঁর গল্পে রয়েছে। ভূত, প্রেত, দৈত্য, রাক্ষস, পশু, পাখি ইত্যাদি মানবেতর জীব ও প্রাণীর উপস্থিতিতে তাঁর গল্পগুলি পরিপূর্ণ। তাঁর গল্প সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন— "আজগুবি গল্পের আধারে ত্রৈলোক্যনাথ অনায়াসে পরিবেশন করেছেন নিভৃত, গোপন জীবন-রস। নিজের জীবনের মতই তাঁর রচনাবলিও বস্তু সঞ্চয়ে পীড়াকর প্রয়াস পরিত্যাগ করে বাস্তব অনুভবের ভারহীন স্বাজুতাকে আহরণ করেছে আমূল।"

রঙ্গ-ব্যঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের প্রবল অধিকার। অবশ্য তিনি শুধু স্যাটায়ারিস্ট নন, হিউম্যানিস্টও। তাঁর করুণা মানুষ ও পশু উভয়ের প্রতি বর্ষিত। ঠাকুরমশাইয়ের পাঠার ব্যাবসা (মুক্তামালা) বা ঢাক মশাইয়ের বালবিধবা কন্যা কুন্তলার (ডমরু-চরিত) গল্পে পশু ও মানুষের প্রতি লেখকের দরদ প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে ভণ্ডামি, প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার ব্যবসায়ীদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ তাঁর লেখনীমুখে অগ্নিবর্ষণ করেছে। উদ্ভট কল্পনার অবাধ প্রকাশ ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে অসামান্য নৈপুণ্য তাঁর গল্পকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অসম্ভব ও উদ্ভটের রাজ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দবিহার। মুক্তামালা, ডমরু চরিত ও ভূত ও মানুষ গ্রন্থে এর বহুল পরিচয় বিধৃত।

৪.৩.২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৬৩)

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। সমাজ-রুচি ও সাহিত্য-রুচির পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর গল্পের উপভোগ্যতা অদ্যাবধি বর্তমান। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি হল— 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৪), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৬), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' (১৮২৮), 'নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৯), 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১)।

তাঁর গল্পে ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত। স্পষ্ট পরিণতি-সমৃদ্ধ তৃপ্তিকর সমগ্রতায় নিটোল গল্প তাঁর লক্ষ্য। অনেক কৌতুককর পরিস্থিতি, আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার সাহায্য তিনি নিয়েছেন; গল্প শেষে সব সমস্যার সমাধান চেয়েছেন তিনি। তাঁর গল্পের আবেদন বুদ্ধিগ্রাহ্য। তিনি ঘটনাবাহুল্য অনেকাংশে বর্জন করেছেন তবে ঘটনা নির্ভরতা পরিহার করতে পারেননি। তাঁর গল্পকথন ভঙ্গি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রভাতকুমারের পরিমিতিবোধ ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। পরিবেশনের দক্ষতায় তাঁর গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি কোথাও ভাববাদের প্রেরণাও বাস্তবকে লঙ্ঘন করেননি। তাঁর চিত্রিত সমস্ত চরিত্রই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে জাত। প্রভাতকুমারের শিল্প বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন— "প্রভাতকুমারের শিল্প প্রকৃতির প্রবৃত্তিই ছিল গতি, স্থিতি নয়। পথ চলতে দু-হাতের মুঠোভরে জীবনের যতটুকু পেয়েছেন, কথার মধ্যে তাকে ঠিত তেমনি দিয়েছেন ধরে।"

অনেক সমালোচক প্রভাতকুমারকে মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু মোপাসাঁর নিষ্ঠুরতা প্রভাতকুমারের মধ্যে নেই, তিনি ক্ষমাপরায়ণ উদার জীবনশিল্পী। তাঁর গল্পে লম্পট মিথ্যাবাদী পোস্টমাস্টারও ক্ষমা পায় (পোস্টমাস্টার), শ্বশুর জামাতার লড়াই শেষ পর্যন্ত মধুর পরিণতিতে পৌঁছায় (বলবান জামাতা), অদ্ভুত কল্পনাও রৌদ্ররস ও কৌতুকরসে মিশে অভিনব মাধুর্য লাভ করে (রসময়ীর রসিকতা)। শিল্পসংযম, ঘটনাবিন্যাস ও পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারাই তিনি এই সব গল্পে রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন।

৪.৩.৩ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে পঞ্চাশ-বাহান্নটি গল্প রচনা করেন, তিনি নৈরাশ্যবাদী লেখক। মানব জীবনের নিষ্ফলতা ব্যর্থতার আড়ালে এক ক্রূর রহস্যময় শক্তির প্রভাব সম্পর্কে লেখক সর্বদা সচেতন। সংশয় লেখককে নিয়ে গেছে দুঃখে, হতাশায়, তাঁর ছোটোগল্পে ভাগ্যহীন মানুষের হতাশা, বেদনা, ব্যর্থতা, অসহায়তা প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের শুভ পরিণতিতে তিনি আস্থাহীন। জীবন-রহস্যের কূলহীন অতল আঁধারের দিকে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা নয়টি— 'বিনোদিনী' (১৩৩৪), 'রূপের বাহিরে' (১৩৩৬), 'শ্রীমতী' (১৩৩৭), 'উদয়লেখা' (১৩৩৯), 'তৃষিত সৃক্কণী' (১৩৪৯), 'রতি ও বিরতি', 'উপায়ন' (১৩৪১), 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক' (১৩৪১), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৩৪২), 'মেঘাবৃত অশনি' (১৩৫৪)।

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের গল্প উপন্যাসের মূলে প্রকৃতির এক অমোঘ রহস্যময় শক্তির অনিবার্য প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। এই শক্তিকে অনেকে 'কুচক্রী অন্ধ নিয়তির লীলা' বা 'শয়তানী শক্তি' বলেছেন। কেউ বা বলেছেন 'দৈব-নির্যতনী শক্তি'। এই সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'সাহিত্য বিতান' গ্রন্থে বলেছেন "মানুষের জীবনের অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে; মনে হয় জীবনের অলোকোজ্জ্বল নাটাশালার এক প্রান্তে, একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার;" এই ব্যতিক্রমি দৃষ্টিভঙ্গি জগদীশচন্দ্র গুপ্তকে 'রিয়ালিজমে'র একধাপ উপরে চূড়ান্ত বাস্তবতার 'ন্যাচারিলিজমে'র শিল্পী হিচাপে চিহ্নিত করেছে।

তাঁর গল্পে মানবিক সম্পর্ক স্বার্থ-চালিত, মানুষের প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যৌন প্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়, মানুষ স্বভাবতই নির্মম, আর নিয়তি কুচক্রী ও শয়তান। তাঁর গল্পে মানুষের যে অসহায়তা ও পরাজয় চিত্রিত হয়েছে, যে তিক্ত, নির্মম জীবনদৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে, নিয়তির যে নিষ্ঠুর জয় ঘোষিত হয়েছে, তা সাধারণ পাঠককে তাঁর প্রতি বিমুখ করে তুলেছে; ফলত জনপ্রিয়তা তিনি কোনোদিনই লাভ করতে পারেননি। কল্লোলীয় রোমাণ্টিক ভাবালুতা থেকে জগদীশ গুপ্ত বাংলা গল্পকে এক রুক্ষ, নির্মোহ, হতাশাময় লোকে স্থানান্তরিত করেছিলেন। গল্পকার হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, নিরাবেগ— চরিত্রের প্রতি তাঁর কোনো পক্ষপাত নেই, বয়নে বিধৃত বিষয়ের সঙ্গে তিনি ডিটাচ্‌ড। শিল্পী হিসাবে তিনি রিয়ালিজম নয়, ন্যাচারালিজমেরই রূপকার।

৪.৩.৪ বনফুল

'শনিবরের চিঠি'র হাত ধর বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭৯) বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ। তাঁর ছোটোগল্প সংখ্যায় বহুল, বৈচিত্র্যে অফুরান, তাঁর সৃষ্টি বিচিত্র ও বর্ণবহুল।

'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই 'প্রবাসী' পত্রিকাই ১৩২৯ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম গল্প 'চোখগেল' প্রকাশিত হয়। তখন তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজের ছাত্র। উপন্যাসের তুলনায় তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা কম হলেও সার্থক ছোটোগল্পকার হিসেবেই তার নাম বেশি পরিচিত। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি— 'বৈতরণীর তীরে' (১৩৪৩), 'বনফুলের গল্প' (১৩৪৩), বনফুলের আরো গল্প' (১৩৪৫), 'বাহুল্য' (১৩৫০), 'বিন্দু বিসর্গ' (১৩৫১), 'অনুগামিনী' (১৩৫৪), 'ঊর্মিমালা' (১৩৬২), 'দূরবীণ' (১৩৬৮), 'আরও কয়েকটি' (১৩৫৪), 'নব মঞ্জুরী' (১৩৬১), 'রংগনা' (১৩৬৩), করবী (১৯৫৮ ইং), 'সপ্তমী' (১৯৬০ ইং) 'তন্বী' (১৩৬৫), 'অদৃশ্য লোক' (১৯৪৬ ইং) 'মণিহারা' (১৯৬৩ ইং), 'ছিটমহল' (১৩৭১), 'এক ঝাঁক খঞ্জন' (১৩৭৪), 'বহুবর্ণ' (১৩৮৩), 'বনফুলের নতুন গল্প' (১৩৮৩)।

বনফুল জীবন সম্বন্ধে সদাজাগ্রত কৌতূহলবিশিষ্ট খেয়ালি ও ওরিজিন্যাল মানসিকতাসম্পন্ন। সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনের সকল অনুপুঙ্খকে তিনি স্বীকার করেছিলেন। তাঁর ছোটোগল্পে মানবজীবনের বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক সুলভ মানসিকতার পরিচয় প্রস্ফুট। পরিচিত সংসারের পরিচিত মানুষের নীচতা-হীনতা-মহত্ত্ব তাঁর গল্পে ধরা

পড়েছে। মানবিক বৃত্তির নির্মম বিশ্লেষণে অতিপ্রাকৃত রস সৃষ্টিতে, বিজ্ঞানদৃষ্টির সার্থক প্রয়োগে তাঁর ছোটোগল্পগুলি দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর অন্যতম হাতিয়ার। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির যুগপৎ মিলনের ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মে এক অনন্য স্বতন্ত্রতার প্রকাশ ঘটেছে। বৃহত্তর জীবনের যে খণ্ডাংশের রূপায়ণ ছোটোগল্পে সাধারণত ঘটে থাকে, বনফুল সেই জীবনখণ্ডের সার্থক রূপকার। বনফুলের ছোটোগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়নের কথা বলতে গিয়ে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে শব ব্যবচ্ছেদের ছুরি। যার নির্মম নিপুণ ব্যবহার হয়েছে তার ছোটোগল্পের মানব জীবনের বিশ্লেষণ। আমাদের পরিচিত সংসারের, পরিচিত মানুষের হীনতা, নীচতা, মহত্ব, ঔদার্য তাঁর বিশ্লেষণের সূচীমুখে ধরা পরেছে। অতিপ্রাকৃত রস সৃষ্টিতে, হীনতা -নীচতার নির্মম বিশ্লেষণের, বিজ্ঞান দৃষ্টির সার্থক প্রয়োগে, সুদৃঢ় প্রচারী সদা অতৃপ্ত কৌতুহলের ব্যাপক ব্যবহারে তাঁর ছোটোগল্পগুলি হীরের টুকরোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

৪.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা

পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০) ঃ

পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু বিশ শতকের প্রথমপাদের শেষ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত মোট ৩৫ বছর যাবৎ রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক-উইট-হিউমার-স্যাটায়ারধর্মী গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পের সংখ্যা একশো। তাঁর গল্পগ্রন্থ নয়টি, এগুলি হচ্ছে— গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প, গল্পকল্প, ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প, নীলতারা ইত্যাদি গল্প, আনন্দবাঈ ইত্যাদি গল্প, চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প।

পরশুরামের ব্যঙ্গগল্প উদ্দেশ্যমূলক, তাঁর রঙ্গ-কৌতুকের পিছনেও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন। তাঁর প্রধান অবলম্বন ব্যঙ্গ, অপ্রধান অবলম্বন কৌতুক, প্রেম, প্রচ্ছন্ন হৃদয়বেদনা। তাঁর বিরল কৃতিত্ব ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতির ও প্রেমের সহ পরিবেশন। তাঁর ব্যঙ্গের উপযুক্ত বাহন তাঁর ভাষা, গড্ডলিকা ও কজ্জলী গ্রন্থদ্বয়ের সাধুভাষা ব্যঙ্গের যোগ্যতম বাহনরূপে দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহতায় তিনি যে গল্পগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি জাতির চিত্তাকাশে স্থায়ী দীপ্তি নিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র-রূপ স্থান গ্রহণ করেছেন। আধুনিক জীবনের নানা নিগূঢ় অসঙ্গতি তাঁর পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। এমনকি প্রাচীনকালের অসঙ্গতিপূর্ণ প্রথাবদ্ধ সংস্কারকে তিনি হাসির উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনের অসঙ্গতিকেই তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৫) ঃ

'কালিকলম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোল সমসাময়িক যুগের অন্যতম ছোটো-গল্পকার। তাঁর গল্পগ্রন্থ হ'ল - 'অতসী', 'বধুবরণ', 'নারীমেধ', 'মারণযন্ত্র', 'দিন-মজুর', 'নারীজন্ম', 'ভালোবাসার নেশা', 'ঠিক ঠিকানা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'প্রেমের গল্প' ইত্যাদি। তার গল্প সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন - "শৈলজানন্দের গল্পে কাহিনি আয়োজন ব্যতিরেকে যেন আপনার বেগেই পথ কাটিয়া চলিয়াছে। লেখক

সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছেন, কখনও তিনি নিজের হৃদয়াংশ যোগ অথবা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিশ্লেষণ গভীরতা অথবা বর্ণদীপ্তি আনিতে চেষ্টা করেন নাই। স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশর সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরাজিতে বলে 'লোক্যাল কালার' তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণরূপে দেখা গেল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম খণ্ড) বাংলা-বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলের জীবনকথার রূপদান করাই তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়।

মনোজ বসু (১৯০৭-১৯৮৭) ঃ

কল্লোগযুগের গল্পকার মনোজ বসু প্রায় দেড়শত ছোটোগল্প রচনা করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ গুলি হ'ল - 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'একদা নিশীথকালে', 'দুঃখ নিশার শেষে', 'পৃথিবী কাদের' ইত্যাদি।

মনোজ বসু যেহেতু কবিসত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই তাঁর গল্পগুলিতে রোমান্টিক স্বপ্নের ছোঁয়া রয়েছে। এছাড়া তাঁর গল্পে রয়েছে অতীত ঐতিহ্যপ্রীতি, রোমান্সের আকর্ষণ, অতিপ্রাকৃত পটভূমি, নিম্নবিত্তদের প্রতি সহানুভূতি এবং রাজনৈতিক চেতনা। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত ছোটোগল্প হ'ল - 'বনমর্মর', 'রায়রায়ানের দেউল', 'চির-বিদায়', 'রাত্রির রোমান্স', 'সীমান্ত', 'ঘরে আগুন', 'বাঘ', 'গয়না', 'প্রেতিনী', 'ছায়াময়ী' ইত্যাদি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) ঃ

কল্লোল পর্বের অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছোটোগল্পকার হিসেবেই বেশি খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি অজস্র ছোটোগল্প রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হ'ল - 'টুটাফাটা', 'ইতি', 'অধিবাস', 'অকাল বসন্ত', 'সংকেতময়ী', 'দিগন্ত', 'রুদ্রের আবির্ভাব', 'কালোরক্ত', 'সারেঙ', 'মগের মুলুক', 'একরাত্রি' ইত্যাদি।

পেশাগত জীবনে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন মুন্সেব। তাই নানা ধরনের মানুষের সাক্ষাৎ লাভের ফলে বিচিত্র চরিত্র তাঁর গল্পে ভিড় করে এসেছে। আবার তাঁর রোমান্টিক কবিমন বিদ্রোহ ও উন্মাদনাকে তুলে ধরেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী হতাশা, আদর্শের অভাব, যৌনচেতনা তাঁর ছোটোগল্পে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁর ছোটোগল্পের চরিত্রগুলি শহর ও গ্রাম উভয় স্থান থেকে গৃহীত। সমসাময়িক মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক সংকটের স্বরূপ তাঁর ছোটোগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু ছোটোগল্পের রূপকার নন, তিনি ছোটোগল্পের ব্যাখ্যাতা ও তত্ত্ববিদও ছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ঃ

একাধারে কবি-বিজ্ঞানি ও গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা ছোটোগল্প রচনায় অসাধারন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির নাম - 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'অফুরন্ত', 'পঞ্চাশর', 'মৃত্তিকা', 'মহানগর', 'ধূলি ধূসর', 'কুড়িয়ে ছাড়িয়ে', 'সামনে চড়াই', 'সপ্তপদী', 'নানা রঙে বোনা' ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পে মানব-জীবনের রহস্য উন্মোচনে মানুষের স্থূল ও আপাত কুৎসিত প্রবৃত্তি মধ্যে প্রবেশ করে সন্ধান করেছেন জীবনের প্রকৃত অর্থ। মানুষের অরন্য রহস্য এমনই বিভীষিকাময় যে তা পার্থিব অরন্যকেও ছাড়িয়ে যায়— প্রেমেন্দ্র মিত্র এই কথাটা যথার্থ বুঝেছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রেমচেতনায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন মানুষের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত কাপুরুষতাকে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন— দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দুর্বল মুহূর্তে প্রেমের সারবস্তুটি স্খলিত হয়ে পড়েছে মানুষের মুষ্টি থেকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হল - 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'হয়তো', 'শৃঙ্খল', 'স্টোভ', 'শুধু কেরাণী', 'ভবিষ্যতের ভার', 'পুন্নাম' ইত্যাদি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ঃ

রবীন্দ্র-পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য গল্পকার। লেখক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে একবার জানিয়েছিলেন— 'ছোটোগল্প লিখে অনেক তৃপ্তি পাই'। চরিত্র সৃষ্টিতে মুন্সিয়ানা ও জমিয়ে পরিবেশ রচনায় তিনি অসাধারন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের অন্যতম উপাদান হচ্ছে সময়চেতনা। সাম্যবাদী চেতনা, মানবিকতাবোধ, প্রতিবাদীচেতনা ও সুভবোধের জাগরণ তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলি হল— 'বীতংস', 'পাশাপাশি', 'টোপ', 'হাড়', 'রেকর্ড' ইত্যাদি।

৪.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ দেখে নেওয়া যাক। রবীন্দ্র ছোটোগল্পের স্তর বিন্যাসটি লক্ষ করলে দেখা যায় প্রথম স্তরে নিটোল রসপুষ্ট কাহিনিই তিনি রচনা করেছেন। দ্বিতীয় স্তরে প্রাধান্য পেয়েছে বুদ্ধিনির্ভর তাত্ত্বিকতা আর তৃতীয় স্তরে রয়েছে আধুনিক জীবন-সমস্যা। তাঁর ছোটোগল্প প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্বন্ধে এবং মানবমনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় পূর্ণ।

রবীন্দ্র-সমকালীন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ফুটে উঠেছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও উদ্ভটরস। ক্ষমা পরায়ণ উদার জীবনদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে। পরশুরামের গল্পে রয়েছে বিচিত্র হাস্যরস এবং তারই পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য কাজ করেছে। জগদীশচন্দ্র গুপ্তের গল্পে নৈরাশ্যবাদী চিন্তা-চেতনা কাজ করেছে। ন্যাচারলিজমের বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পে স্পষ্ট। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের মিলিত যুগপৎ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে বনফুলের গল্পে।

৪.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ-১ দ্রষ্টব্য।

৪.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটোগল্পের পথনির্মাতা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী'। আলোচনা করুন।

২। বাংলা ছোটোগল্পের বাস্তবতার ধারায় যে সূচনা হয়েছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় দিন।

৩। রবীন্দ্র ছোটোগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের জীবনদর্শন তাঁর গল্পে কীভাবে ফুটে উঠেছে, তার বিবরণ দিন।

৫। বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে বনফুলের ছোটোগল্পের স্থান নির্ণয় করুন।

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন—
চার ইয়ারি কথা, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

৪.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

১। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস— ক্ষেত্র গুপ্ত।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ-৮ম খণ্ড) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত— ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য— ক্ষেত্র গুপ্ত।

৫। বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (২য় খণ্ড)— গোপাল হালদার।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য— সুকুমার সেন।

৮। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (২য় খণ্ড)— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। বাংলার রেনেসাঁস — অন্নদাশঙ্কর রায়।

১০। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী।

১২। বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ।

১৩। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য— সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৪। বাংলার নবজাগরণ— মতিলাল মজুমদার।

১৫। কল্লোল যুগ— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়—৪র্থ পর্যায়)— ভূদেব চৌধুরী।

১৭। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা— ভূদেব চৌধুরী।

১৮। রামমোহন ও বাংলা সাহিত্য— প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

১৯। সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ— জীবেন্দ্র সিংহরায়।

২০। বাংলা ছোটগল্পের দিগ্বলয় - তরুণ মুখোপাধ্যায়।

২১। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী।

২২। সাহিত্য বিতান - মোহিতলাল মজুমদার।

২৩। কালের পুত্তলিকা - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

২৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)— দেবেশকুমার আচার্য

২৫। সাহিত্যের খুঁটিনাটি— রাণু ঘোষ কর্মকার

২৬। Studies in Bengali Poetry– Humayun Kabir.

২৭। Studies in Bengali Novel– Humayun Kabir.

২৮। Western Influnce in Bengali Literature– Priya Ranjan Sen.

২৯। Bengali Literature in the Nineteenth Century– Sushil Kumar.

****